প্রকাশক :

বি. কুণ্ডু

৮ বি/১ টেমার লেন

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :

১৩ই এপ্রিল

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস ১৯৫৭

মুদ্রাকর :

শ্রীসুনীলকুমর ভাণ্ডারী

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স

কলিকাতা-৯

স্বাধীনতা সংগ্রামে
মুর্শিদাবাদ

উৎসর্গ

কেউ জানে না তাদের····কোনদিন তাদের নাম ওঠেনি কোন খবরের কাগজে···কোনদিন কোন ফটোগ্রাফার ছবি তোলেনি তাদের জন্য, তাদের স্মরণ করে কেউ পালন করেনি জন্ম-মৃত্যু তিথি।

জগতের কোন ইতিহাসে থাকে না তাদের নাম লেখা। জাতির মহাবিস্মৃতির অন্ধকারে তারা জন্মায়, চিরবিস্মৃতির অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে যায়।

অথচ আমি দেখেছি তাদেরই পিঠে পড়েছে পুলিশের লাঠি····তাদেরই বুকে লেগেছে প্রথম বুলেট, তাদেরই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। তাদেরই হাতের বজ্রমুষ্টি থেকে লবণ কেড়ে নিতে দানব পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। এগিয়ে গিয়েছিলে বলে তুমি আজ অগ্রণী। সৈন্যরা চলেছে সংগ্রামে এগিয়ে। পেছনে কারা ম্লানমুখে রইলো দাঁড়িয়ে? কেউ বা জোর করে হাসতে চেষ্টা করে কান্নায় পড়ল ভেঙ্গে? আমি দেখেছি তাদের কারুর কোল থেকে চলে গিয়েছে একমাত্র পুত্র। কারও পাশ থেকে সরে গিয়েছে চির জীবনের মত তার স্বামী। দিনের পর দিন দ্বীপান্তরের পানে চেয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে তাদের চোখের দৃষ্টি। উপবাসে মাটিতে বুক দিয়ে কাটিয়েছে দিন। তাদেরই ঘর খালিকরে ভরে উঠেছে স্বাধীনতার সংগ্রাম-পাত্র।

তুমি-আমি জল পাব বলে তারা নিয়ে গিয়েছে শুধু তৃষ্ণা। তুমি-আমি অন্ন পাব বলে তারা নিরন্ন মরেছে দলে দলে। তোমার-আমার আকাশে সূর্য উঠবে বলে তারা জেগে গিয়েছে আমাবস্যার হিমশীতল রাত্রি।

হে নূতন যাত্রি, একবার নত মস্তকে দাঁড়িয়ে তাদের স্মরণ করো। যাদের স্মৃতির কোন চিহ্ন নেই, নিঃশেষে যারা মরে গিয়েছে, দু'ফোঁটা চোখের জলে তাদের শ্রদ্ধা জানাও।

যে মাটিতে পা ফেলে চলেছ, মনে থাকে যেন, তার ধুলোতে মিশে আছে তাদের দেহাস্থিচূর্ণ।

সেই নামহীন
সেই সাধারণ
সেই বিস্মৃতদের
উদ্দেশেই উৎসর্গ করলাম।

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

ভূমিকা

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য গান্ধিজী দেশের নিকট আহ্বান জানালেন, তখন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত মুর্শিদাবাদ জেলাও অকুণ্ঠিত চিত্তে সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই মুর্শিদাবাদ জেলা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সকল বয়সের সকল শ্রেণীর মানুষই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসেছিল স্বরাজের ব্রতকে সফল ও সার্থক করে তুলবার জন্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার নানাস্থানে ছোট ছোট কর্মী-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল কর্মিগণকে সংগঠিত করা। জেলার স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র নির্ভীকভাবে বিদ্যাভবন থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে লাগল। কিছু সংখ্যক আইনজীবীও আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় বিদ্যালয়, কর্মকুটির অথবা স্বেচ্ছাসেবক কর্মকেন্দ্র। এইসব প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবকদেরকে অহিংস সংগ্রামের নবতর কৌশলাদি শিক্ষা দিতে তৎপর হ'ল। এঁরা সব মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামে গ্রামে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করল, তখন সরকারপক্ষ নিরপেক্ষ দর্শকের মত বসে থাকলেন না। তারা তখন আন্দোলনকে দমন করবার জন্য সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করতে লাগলেন। তারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে গ্রেপ্তার, ধর-পাকড় ও কারানির্যাতন দ্বারা দেশের সংহত শক্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। সারা জেলায় ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। শত শত স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিগণ ধৃত হলেন। তাদের একটা লোকদেখান বিচারও হ'ল ;- কিন্তু কোন ধৃত ব্যক্তি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না ; ফলে তাঁরা দলে দলে দণ্ডিত হলেন। এইভাবে সরকারপক্ষ অসহযোগ আন্দোলনের সহিত মোকাবেলা করলেন। ওদের রুদ্র আঁখি যতই ক্ষুদ্রতর হ'তে লাগল আমাদের সংগ্রামব্রতী কর্মিগণের উৎসাহ-উদ্দীপনাও ততই জোরদার হ'তে লাগল। তা কিছুতেই দমিত হ'ল না। অসহযোগ আন্দোলনের পর যতবার স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে ততবারই মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নির্ভীকভাবে সংগ্রামে যোগদান করেছেন ও প্রসন্ন চিত্তে কারাবরণ করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর এল প্রথম অইন অমান্য আন্দোলন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল আইন-অমান্য আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বিশেষ। দেশের শত শত কর্মী লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেন ও আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে লাগলেন। তারপর এল দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এসব আন্দোলনেও মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মিগণ পশ্চাতে পড়ে থাকলেন না। তাঁরাও নির্ভীকভাবে এগিয়ে এলেন আইন অমান্য করার জন্য। সর্বশেষে এল 'আগস্ট বিপ্লব' ও 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। এই সব আন্দোলনের সমস্ত স্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মী ও নেতাগণ অকুণ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সরকারের হাতে নানাপ্রকার নির্যাতনও ভোগ করেছিলেন। বিনা বিচারে বন্দী, আটক আইনে বন্দী, অন্তরীণ, নির্বাসন—এসবের শিকার এ জেলার বহু তরুণ কর্মীকে হ'তে হয়েছিল। কিন্তু কোনরূপ রুদ্রনীতি সংগ্রামী কর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে দমন করতে পারেনি। সরকারের আঁখি যতই রক্তবর্ণ হয়েছে, কর্মীদের উৎসাহ ততই দৃপ্ত হয়ে উঠেছে। বৃটিশ সরকার পারেনি রোধ করতে এ দুর্বার স্রোতকে। তাই পরিশেষে দেখা গেল সারা ভারতের সংগ্রামীদের

উৎসাহ-উদ্দীপনা, অপরিসীম আত্মত্যাগ ও প্রাণ বলিদান ব্যর্থ হ'ল না। জনগণের সংকল্পের জয় হ'ল, ভারত স্বাধীন হ'ল।

এ কথা স্মরণ করা দরকার যে, গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্ব থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার নানাস্তরে একটা রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও চেতনা ছিল। আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয় সিপাহী বিদ্রোহের যুগ থেকে। আর তার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে এই মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরেই। সেই বিদ্রোহ দাবানলের মত সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও এই জেলা পশ্চাতে পড়ে ছিল না, সে যুগেও বহু কর্মী অকুতোভয়ে স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, গুপ্ত সমিতি গঠন প্রভৃতি দেশাত্মবোধমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে স্বাধীনতার ইতিহাসে নিজেদের বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁদের বহু কর্মী নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বন্দীজীবন যাপন করেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে এরা বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রাক-অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ববর্তিকালে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে কর্মিগণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁরা সাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করেন। তাই যখন অসহযোগ ও তার পরবর্তী আন্দোলন আরম্ভ হ'ল সেগুলি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক ও সর্বাত্মক হ'তে পেরেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সব কর্মী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অশেষবিধ নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়। হাজার হাজার মানুষ এই স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর এই জেলাবাসীর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যাঁরা আমাদের জন্য এত ত্যাগ-তপস্যা করলেন তাঁদের খোঁজখবর লওয়া। তাঁরা কে ; কি তাঁদের অবদান, তাঁদের কতজন জীবিত আছেন। যাঁরা পর পারের ডাকে চলে

গিয়েছেন তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়বর্গ কি অবস্থায় আছেন; আর যারা এখনও জীবিত আছেন তাঁরাই বা কিভাবে চালাচ্ছেন, সংসারে তাঁদের সন্তানাদি আজ কি অবস্থায় আছেন। তাঁদের আত্মত্যাগই তো এই স্বাধীনতা এনেছে। তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মদান না পেলে দেশ স্বাধীন হ'ত না। আজ তাঁদের সন্ধান নিতে হবে। তাঁদের আত্মত্যাগের কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করে এ যুগের মানুষের নিকট—বিশেষ করে তরুণদের নিকট তুলে ধরতে হবে। তাঁদেরকে দেখাতে হবে যে শুধুমাত্র স্বাধীনতার আদর্শকে সম্বল করে একদা এ দেশের বীর সন্ন্যাসীগণ কেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অনির্দেশের পথে। প্রথম যুগে স্বাধীনতা ছিল একটা স্বপ্ন, একটা ঐকান্তিক কামনা। সেই স্বপ্ন ও কামনাকেই রূপায়িত করার জন্য তাঁরা নিষ্ঠার সহিত সংগ্রাম করে গিয়েছেন। নিজেকে রেণু-রেণু করে বিলিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতের মানুষ দেখুক কোন্ কোন্ বীরপুরুষ আমাদের জন্য লড়াই করে গেছেন। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতির কথা তাঁরা দিনেকের তরে চিন্তা করেননি। আমরা অকৃতজ্ঞতার অপরাধে ধিক্কৃত হব যদি তাঁদেরকে যথোচিত সম্মান দেখাতে না পারি, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য যদি কিছু করতে না পারি।

একটি ইংরাজি কবিতা পড়েছিলাম, তাতে কোন এক অনাদৃত প্রাচীন সৈনিক দুঃখ করে নিজের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করেছে। সেই সৈনিকটি দুঃখ করে বলছে: হায়! যারা একদিন দেশের জন্য বীরদর্পে সংগ্রাম করেছিল, আজ কেউ তাদের খবর রাখে না। তারা পথে পথে ফেরি করে বেড়ায়। বৃদ্ধ বয়সে তারা যখন পরস্পর মিলিত হয়, তখন তারা বলে, তারা হ'ল—

Old bones to carry old stories to tell
So it is to be an old soldier.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের

অবস্থা কি এইরূপ হবে? তাঁরা কি আজ বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে বিরলে বসে কেবল নিজেদের মধ্যে তাঁদের অতীত যুগের কীর্তিকলাপের কথাই আলোচনা করবেন? অথবা কোনো এক অনিচ্ছুক কানের কাছে সে কথা বলে চলে যাবেন? কেউ কি তাঁদের খবর রাখবে না? পথ দিয়ে চলার সময় কেউ কি তাঁদেরকে দেখে পুলকিত হয়ে তাঁদেরকে সাদর আলিঙ্গন দেবে না? না, তা হতে দেব না। আমরা তাঁদেরকে সম্মান দেব, উপযুক্ত মর্যাদা দেব, তাদের গৌরবে আমরা গর্বিত হব। তাঁদেরকে দেশের সামনে মহাসম্মানে তুলে ধরব। এইভাবে তাঁদের প্রতি আমাদের ঋণভার কিছুটা লাঘব করব।

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীন সংগ্রামীদের বিবরণ নিয়ে এ পর্যন্ত কোন বই লেখা হয়নি। তাঁরা আজ অবহেলিত, তাঁদের কথা এবং জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জেলাবাসী ভুলতে বসেছে। এ যুগের তরুণসম্প্রদায় তাঁদের খোন খবর রাখে না। তাঁদেরকে দেখলে চিনতে পারে না। তাঁদের অনেকে ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে চলে গেছেন। অনেকে দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন। অবশ্য ভারত সরকার কতগুলি শর্তাধীনভাবে কিছু সংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে মাসিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেছেন। ভালই করেছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। তাঁদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু করতে হবে। এখন সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে তাঁদের জীবনী ও আত্মদানের বিবরণ সহ একটা ইতিহাস রচনা করা; তা না হলে জেলাবাসী তাঁদেরকে একেবারে ভুলে যাবে। অথচ তাঁদের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের সকলের সন্ধান করে পুস্তক রচনা করা এক বিরাট কাজ। তবে চেষ্টা করতে হবে। যারা গবেষণা করেন, তাদের নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আনন্দের কথা শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রাথমিক কাজ হিসাবে একটা ছোট পুস্তক রচনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি

যে উপযুক্ত ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্নস্তরে তিনি বরাবরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন। তাতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। তার এই ছোট বইটিতে এ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেক বিবরণ আছে, অনেক না-জানা এবং অপ্রকাশিত তথ্যও আছে। যে সব কর্মী ও নেতাদের নাম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এটা কেবল ভূমিকা মাত্র। আরও বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করা দরকার। প্রফুল্লবাবু একজন প্রথম সারির সাহিত্যিক। সুতরাং তার এই গ্রন্থ পাঠ করে প্রত্যেক সাহিত্যরসিক মুগ্ধ হবেন। এই গ্রন্থের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গ্রন্থটি এই ধরনের প্রথম গ্রন্থ—যা অমর অক্ষরে কতিপয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করবে। এই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও অনেকেই এগিয়ে আসবেন, এই আশা করতে পারি। এই গ্রন্থটি একটি মূল্যবান স্মারক গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবে: এ আশা করতে পারি। আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাঃ—অধ্যাপক রেজাউল করীম

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়		পৃষ্ঠা

বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলের সেই গাছটি যে গাছের নীচে বসে বিদ্রোহী কবি নজরুল অর্দ্ধশতাব্দীকাল আগে বিদ্রোহের গান গেয়েছিলেন।
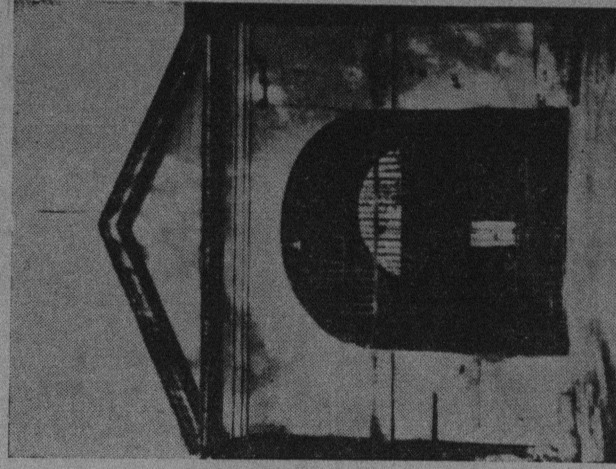
একটি ঐতিহাসিক কারাগার
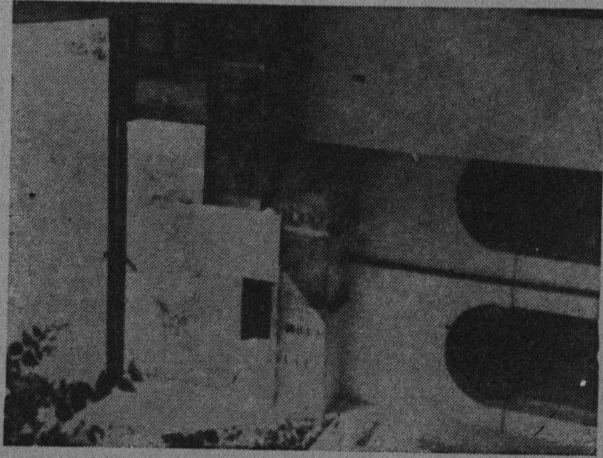
এই ঘরটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্দী জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় কাটিয়েছেন।
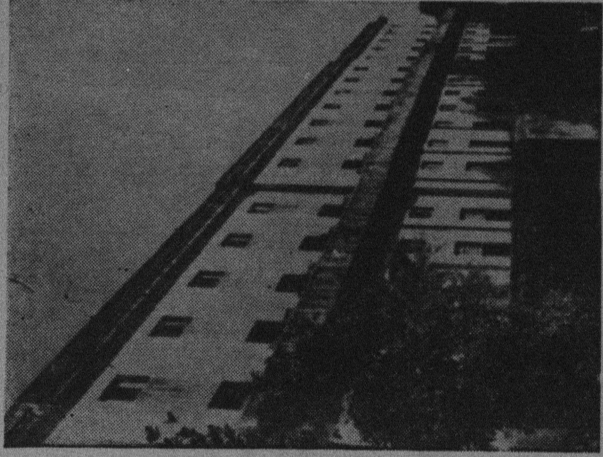
বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলের ৭ং ব্যারাক বাড়ী, ভারতের বহু খ্যাতনামা বিপ্লবীদের স্মৃতি বিজড়িত।
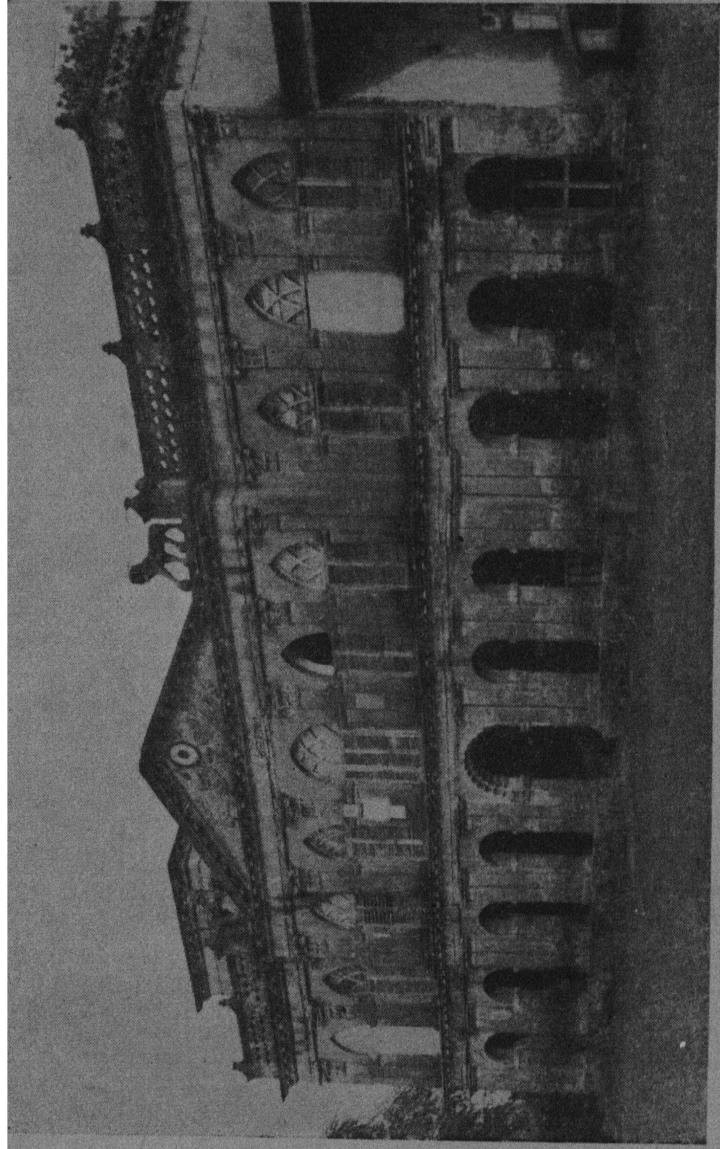
ইংরেজ রাজত্বে কোম্পানীর আমলে ভারতের প্রথম শহীদ মহারাজা নন্দকুমারের বাসস্থান।
কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ী নামে খ্যাত।

বিপ্লবী জগদানন্দ বাজপেয়ী
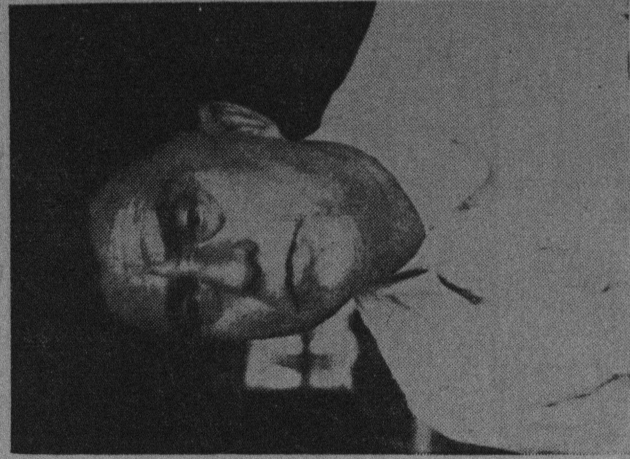
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
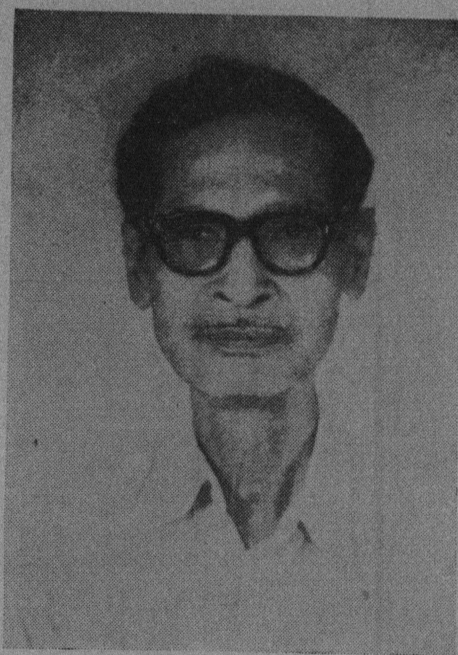
বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য্য
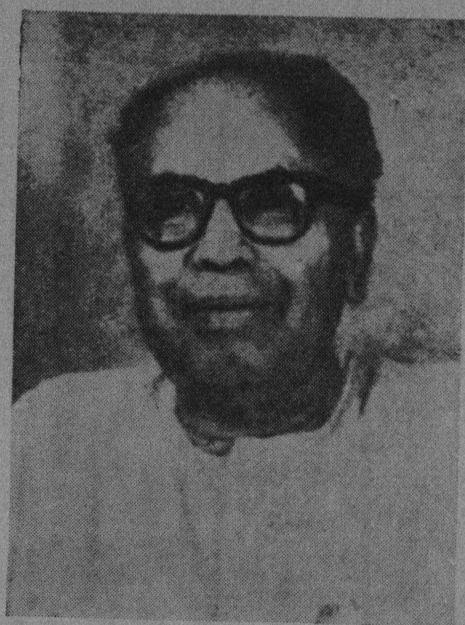
বিপ্লবী নিরঞ্জন সেন

বিপ্লবী অনাদিকান্ত সান্ন্যাল
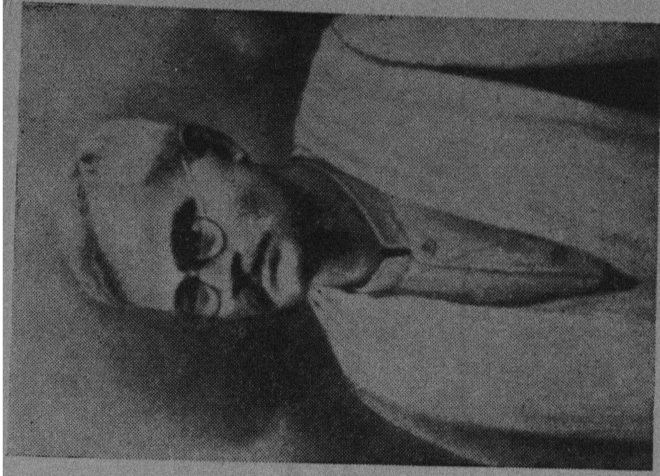
বিপ্লবী ভূপেশ চন্দ্র নাগ
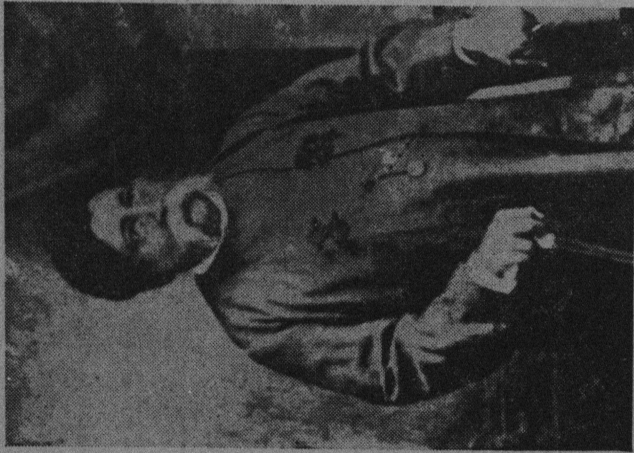
জাতীয়তাবাদী নেতা বৈকুণ্ঠ নাথ সেন
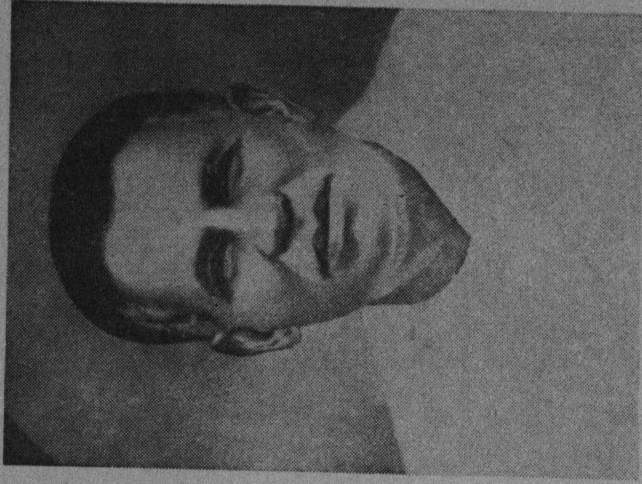
ব্রজভূষণ গুপ্ত

বহরমপুরে মহাত্মা গান্ধী
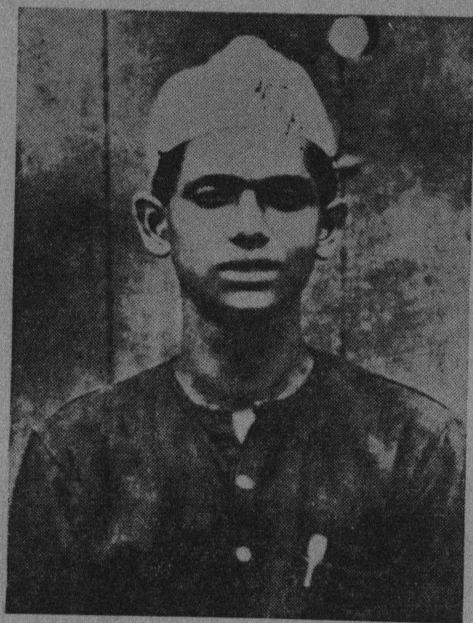
শহীদ নলিনী বাগচী

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
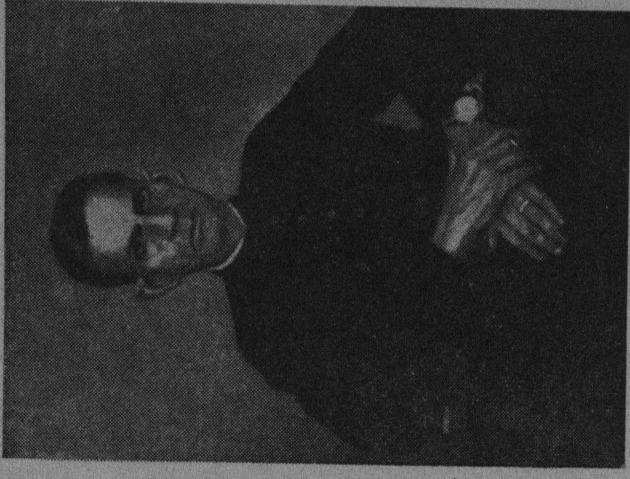
মৌলবি আবদুস্ সামাদ
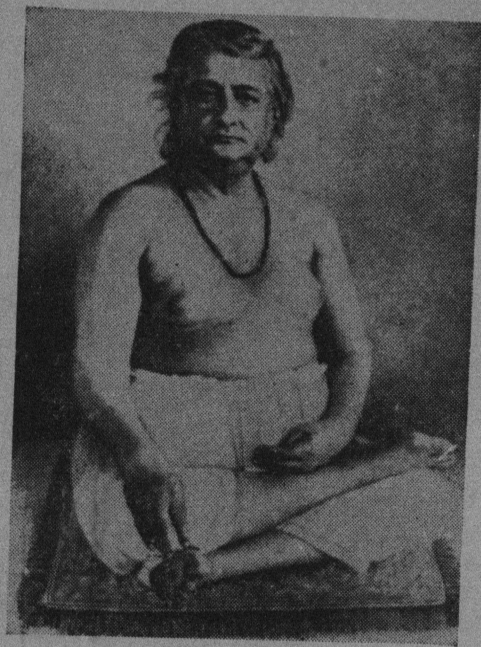
সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা
স্বামী অখণ্ডানন্দ

মুর্শিদাবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা।

গোটা জীবনের ধারাকে যেমন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তেমনি যায় না বংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসকে খণ্ডিত আকারে তুলে ধরা। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলার যেটুকু অবদান, সেও সেই সমগ্রেরই অংশ বিশেষ। কিন্তু সেই আংশিক ইতিহাসটুকু লিখতে বসে দেখছি কত মানুষ এবং ঘটনার সমাবেশই না হয়েছে এই ক্ষুদ্র পরিসরটুকুতে। যে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে নিজে এসেছি এবং নিজেও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলাম, সেই ইতিহাসকেই যেন নতুন করে পড়তে হ'চ্ছে। অতীতের কত ঘটনা যেন আজ অবিশ্বাস্য বলেও মনে হ'চ্ছে। সেই সবের যথা-যত মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হয়েছিল এই মুর্শিদাবাদে, এই মুর্শিদাবাদের মাটিতেই বাংলা বিহার ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ নিহত হয়েছেন ; আর হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার মারাত্মক অস্ত্রাঘাতে লর্ড ক্লাইভ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন এই মুর্শিদাবাদে। আবার পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রধর ভারতীয় সিপাহীরা যে বিদ্রোহ বাধিয়েছিল হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তার যে সূচনা, সেও এই বহরমপুরেই। এই মুর্শিদাবাদেই ইংরেজ রাজত্বে কোম্পানীর আমলে ভারতের প্রথম শহীদ মহারাজা নন্দকুমার। মীরমদন, মোহনলাল, যেমন এই মুর্শিদাবাদের, আবার মীরজাফর, উমির্দাদ, জগৎ শেঠ ও মুর্শিদাবাদের। সিরাজ সমাধি ; সিরাজের বধ্যভূমি যেমন ছেলেবেলায় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনি বহু বঙ্গ সন্তানকেই ভাবাপ্লুত করেছিল।

মীরজাফরের কবর এবং পলাশী—যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ তেমনি আমাদের অন্তরে দাহ সৃষ্টি করেছে। নবীনচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ ক'রে সে যুগের কত কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিককে লেখার উপাদান এবং প্রেরণা জুগিয়েছে যেমন এই মুর্শিদাবাদ, তেমনি আবার কত বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংকল্পকে কঠোর করে তুলেছে এই মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের আন্দোলন, সংগ্রাম এবং ত্যাগ যেমন বৃহত্তর বাংলা তথা ভারতের আন্দোলনের সঙ্গে একিভূত হয়ে গিয়েছে, তেমনি ভারতের দূরতম প্রদেশের কোন একজন বিপ্লবীর আত্মদান মুর্শিদাবাদের বিপ্লবীদেরকেও আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করেছে। শহীদ নলিনী বাগ্চী সেখানে শুধু মুর্শিদাবাদের নয়, সারা বাংলা তথা ভারতের, আবার সুদূর সাতারার হিমুকালান মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতি ঘরনীর আপন সন্তান বলে বিবেচিত না হয়ে পারে না।

বাংলাদেশ, ঝড়ের কেন্দ্রস্থল।

বাঙ্গালীর বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও প্রতিভা দেখে ইংরেজ কুটনীতিকেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রতিপদে তার প্রতিভাকে খর্ব করার চেষ্টা হ'তে লাগল। অপবাদ রটনার ভার পড়ল মেকলে প্রভৃতি লেখকদের ওপরে। আত্মপ্রসারের পথ সীমাবদ্ধ করতে লাগল শাসকগোষ্ঠী। নির্বীর্য্য জাতি বলে ঘোষণার জন্য সামরিক বৃত্তি বাঙ্গালীর প্রতি নিষিদ্ধ হয়ে রইলো। ভারতের শাসকগোষ্ঠী আসেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। বাঙ্গালীরা অবকাশ পেয়ে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপরাজেয় হয়ে উঠতেই, সে পথও রুদ্ধ করতে চাইল বিলেতের কর্তৃপক্ষীয় ষড়যন্ত্র। প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কিন্তু সেই ঝড়ের কেন্দ্রস্থল কোথায়? এই বাংলাদেশ। সেই ঝড় ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড স্যালিসবেরী ভারত সচীব

থাকাকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার বয়স সীমাবদ্ধ করে এক আদেশ জারী হ'ল। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে এক স্মারক লিপি তৈরী হয়। বাংলার লালমোহন ঘোষ বিলেতের কমন্স সভায় সেই স্মারকলিপি নিয়ে যান। তাঁর আশ্চর্য্য বাগ্মিতায় কমন্স—সভার সদস্যগণ প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। লালমোহন ঘোষই প্রথম ভারতীয় যিনি পার্লামেণ্টে প্রথম বক্তৃতা দেওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম উদারনীতিকদের পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

এক ইংরেজ লেখক, স্যার হেনরীকটন 'নূতন ভারতের', পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, বাঙালী বাবুরাই সে সময়ে পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনমত গঠন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন যে একজন বাঙালী বক্তার ইংরেজী বক্তৃতা সে সময়ে সমগ্র ভারতে যথেষ্ট প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই বাঙালী বক্তা, যিনি ইংরেজ শাসনরীতির বিরুদ্ধে সমগ্রভারতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের ধ্বনি তোলার জন্য ভারত পর্য্যটন করেছিলেন এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অভিযোগগুলিকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। মূর্খ শাসক গোষ্ঠী এই দাবানল প্রতিহত করার জন্য বাংলার অখণ্ড সত্তাকে ছুরিকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করলেন।

অশ্রুসিক্ত বেদনার দীর্ঘ ইতিহাস। লর্ডকার্জনের আগে এক প্রস্তাব ওঠে যে, চট্টগ্রাম ডিভিসনের অন্তর্গত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা বাংলা দেশ থেকে কেটে নিয়ে আসামে জুড়ে দেওয়া হবে। প্রবল প্রতিবাদের জন্য, কিছুদিনের জন্য তা প্রত্যাহার করা হয়। লর্ড কার্জনের আমলে সেই প্রস্তাব আরও ভীষণ আকার ধারণ করে। কথা হয় যে, সারা চট্টগ্রাম ডিভিসন তো বটেই, তার সঙ্গে ঢাকা ও ময়মন সিংহ জেলাও আসামে জুড়ে দেওয়া হবে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। কুটবুদ্ধি নিয়ে লর্ড কার্জন পুর্ববাংলা পরিদর্শনে বেড়োন। মুসলমানদের

হাত করাই ছিল সেই সফরের গোপন উদ্দেশ্য; কিন্তু মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্যের অতিথি হয়ে তাঁর মতটাও জেনে নিলেন। আরও গভীর গোপন গুহাদেশে রচিত হ'ল পরিকল্পনা। এবারকার নবপরিকল্পিত প্রদেশে উত্তর বাংলা, ফরিদপুর এবং বরিশাল ও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সবটাই গোপনে গোপনে সম্পন্ন করে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে পরিকল্পনাটি ঘোষণা করা হ'ল। পরিস্কারভাবে বলা হ'ল, নতুন পূর্ববঙ্গ—আসাম প্রদেশটি মুসলমানদের জন্যই হ'ল। আকস্মিক বজ্রপাতের মত এল ১৯০৫ সালের জুলাই মাসের ঘোষণা কিন্তু বাংলা গর্জন করে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ সারা বাংলার মর্মস্থল প্রতিধ্বনিত করে বলে উঠলেন—তোমার এই পাকা বন্দোবস্ত আমরা বাতিল করে দেব—We Shall unsettle the settled facts. মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী সম্মেলন বসল। বড়লাটকে তার যোগে জানানো হ'ল যে দেশ বিভাগ যদি অনিবার্যই হয়, তা হলে বঙ্গ—ভাষী এলাকাগুলি যেন একসঙ্গে রাখা হয়।

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট, টাউন হলে এক অভূতপূর্ব জনসভা হ'ল। একাধারে বিলিতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্পোন্নয়নের সংকল্প নেওয়া হ'ল। বর্জন আন্দোলন এমনই ব্যাপক, এমনই তীব্র হয়েছিল যে, ছেলেরা বিলেতী কাগজে পরীক্ষার উত্তর লিখতে অস্বীকার করেছে, পাঁচ বছরের শিশু বিলেতী জুতোর উপহার ফেরৎ পাঠিয়েছে, পুরোহিতেরা বিলেতী জিনিস দিলে পূজো করেনি, বিয়েতে বিলেতী যৌতুক এলে তা নেওয়া হয়নি, যে নেমন্তন্নে বিলেতী লবণ ব্যবহার করা হয়েছে, অতিথিরা তা বর্জন করেছেন এবং সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, এমন হয়েছিল যে, এক শিশু রোগবিকারে পর্য্যন্ত চীৎকার করে বলেছে—"আমি বিলেতী ওষুধ খাব না, খাব না।"

কিন্তু তবু রথ চক্র থামেনি। ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জন অস্ত্রাঘাতে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। সারা বাংলাদেশ

বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো—'বন্দেমাতরম'। ক্রুদ্ধ কর্তৃপক্ষ সেই বেদনাকে তীব্রতর করলেন পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ করে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলার কোন বাড়ীতে উনুন জ্বলেনি। অরন্ধনে কাটলো সারাদিন। একে অপরের হাতে রাখীবন্ধন করলেন। মুর্শিদাবাদের আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা লিখলেন, বঙ্গ ভঙ্গের দিনটিকে দেশবাসীর মনে চিরজাগরুক রাখার জন্য, রবীন্দ্রনাথের মাথায় যেমন উভয় বঙ্গের মিলন সূচক রাখীবন্ধনের পরিকল্পনা জেগেছিল, রামেন্দ্র সুন্দরের মাথায় তেমনি ক্ষোভসূচক অরন্ধনের পরিকল্পনা জুগিয়েছিল। তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করে তা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করে দিয়েছিলেন।

সারা বাংলাদেশে জাগরণের ঢেউ লেগেছে তখন। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ক্ষিপ্তপ্রায়। অবস্থা চরমে উঠলো বরিশাল সম্মেলনে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র হ'ল নিষিদ্ধ। উদ্যোক্তারা মেনেও নিয়েছিল। শোভাযাত্রা নীরবে এগোচ্ছিল। পুলিশের ভাল লাগালো না। শোভাযাত্রার পেছনে যে তরুণ দল আসছিল পুলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বে-পরোয়া মারপিট সুরু হ'ল। তখন তরুণদের মুখে সরবে উচ্চারিত হ'ল—'বন্দেমাতরম' পুলিশ মারে আর বন্দেমাতরম ধ্বনি ওঠে। পাগল হয়ে গেল পুলিশ। মনোরঞ্জন গুহের ছেলে চিত্তরঞ্জন গুহকে ওরা মেরে পুকুরে ফেলে দিল। তখনও তার কণ্ঠে উচ্চারিত হ'চ্ছে, বন্দেমাতরম। কবি লিখলেন—

"বেত মেরে মা ভুলাবি
আমি কি মা'র সেই ছেলে
দেখে রক্তা-রক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবি মা ফেলে।"

অত্যাচার বাংলার তরুণ সমাজের রক্তে সর্বনাসের নেশা ধরিয়ে

দিল। তারা শাসক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসকে পাল্টা সন্ত্রাস দিয়ে জবাব দিতে চাইলো। ১৯০৮ সালের ৩১শে মার্চ বাঙ্গালী তরুণের হাতে বোমা বিদীর্ন হ'ল মজঃফরপুরে। সারাদেশ চমকে উঠলো।

সরকারপক্ষ কেবল যে দেশভাগ করলেন তাই নয়, বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ করলেন তাই নয়, বরিশাল সম্মেলনের প্রতিনিধিদের লাঞ্ছিত করে সম্মেলন ভেঙ্গে দিয়েছে তাই নয়, অথবা পূর্ববঙ্গের লেঃ গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার কুৎসিৎ রসিকতা করে মুসলমানকে সুয়োরানী ও হিন্দুকে দুয়োরানী বলেছেন তাই নয়, সরকারপক্ষ ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য অকারণে বরিশাল সম্মেলনের শোভাযাত্রীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। তরুনের তাজারক্ত ডগ্‌বগিয়ে উঠেছে।

সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, তাঁর কাছে একদিন অকস্মাৎ দুটি ছেলে এসে হাজির। তারা ব্যামাফিল্ড্ ফুলারকে হত্যা করবে, আশীর্বাদ চায়। সুরেন্দ্রনাথ তাদের নিরস্ত করেছিলেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরে মেদিনীপুর জেলার কাছে নরসিংহ গড়ে বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার এণ্ডরুজ ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কেননা ইনিও বঙ্গভঙ্গের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তারপর ভারতের ইতিহাসের এক স্মরনীয় অধ্যায়। ১৯০৮ সালের পয়লা এপ্রিল। সংবাদপত্রে সংবাদ দেখে লোকে চমকে উঠলো। বিহারের মজঃফরপুরে এক বোমা ফেটেছে ; তাতে মারা গিয়েছে দু'জন ইংরেজ মহিলা, মা ও মেয়ে। মজঃফরপুরের ব্যবহার জীবি মিঃ পিংলে কেনেডির স্ত্রীও তাঁর ষোল বছরের মেয়ে। বোমার লক্ষ্য ছিল মজঃফরপুরের জেলা জজ্ মিঃ কিংসফোর্ড। ইনি কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে স্বদেশী বাঙ্গালী ছেলেদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। দেশকে ভালবাসার অপরাধে একাধিক জনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এইখানে ইতিহাস বলছে শাসকশ্রেণী দেশের বুকে অত্যাচারের যে নির্মম

শকট চালাতে সুরু করেছিল, ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী সেই অত্যাচারের জবাব মাত্র। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল, প্রফুল্ল ধরা পড়ার আগেই মোকামা স্টেশনে আত্মোৎসর্গ করল। তারপর ক্ষুদিরাম। আধুনিক ভারতের প্রথম শহীদ। ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নিল। কিন্তু কিসের মৃত্যু। ঘরে ঘরে তাকে নিয়ে কত গান, কি সে আনন্দ এবং উত্তেজনা। "এবার বিদায় দাও মা ফিরে আসি।"

ক্ষুদিরাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে, আবার ফিরে আসবে। নাম না জানা বাউলের গানে, সেই আশ্বাস নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে "চিনতে যদি না পারিস মা চিনবি গলার ফাঁসী।" গলায় দড়ির চিহ্ন দেখে তাকে চেনা যাবে। বাংলার মায়েরা বুঝি আজও প্রসূতিআগারে তারই অপেক্ষায় কাল কাটায়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজও বাউলেরা ক্ষুদিরাম আর কল্পিত এক অভিরামের গান খঞ্জনী বাজিয়ে গেয়ে থাকে। এবং গানের মিল করতে গিয়ে মিসেস কেনেডি ও ভারতবাসী আখ্যা পায়, কিন্তু তবু কেউ আপত্তি করেনা, ভুল সংশোধন করতে চেষ্টা করে না। "অভিরামের দ্বীপ চালান ভাই ক্ষুদিরামের ফাঁসী।" অথবা "লাট সাহেবকে মারতে গিয়ে মারলাম ভারতবাসী।" ভুল কথা, কল্পনার কথা। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে, ক্ষুদিরাম এবং দেশের মুক্তি যজ্ঞে তার আত্মাহুতির কথা। বাংলাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতটা একদিন শৃঙ্খলিত হয়েছিল বলেই হয়তো বাংলার জ্বালা এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। ক্ষুদিরাম' প্রফুল্ল চাকী এরা সকলেই সেই জ্বালার প্রসব।

ইতিহাস বলছে, শেষ পর্য্যন্ত শাসক শক্তিকে তাদের জেদ ছাড়তে হ'ল। যে বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সারা ভারতবর্ষের মাথার ওপরে বিদ্রোহের মশাল তুলে ধরেছিল, ১৯১১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর তা রদ হ'ল বলে ঘোষণা করা হ'ল। কিন্তু সেই আগের বাংলা আর জোড়া লাগল না।

কৃষ্ণনাথ কলেজ
বিপ্লব আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র

এই সব আন্দোলনের ঢেউ মুর্শিদাবাদ জেলাকেও প্রভাবিত করল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে সেদিন যেমন এগিয়ে এলেন জেলার দুই কৃতি সন্তান ডাক্তার রামদাস সেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ সেন; গোপন বৈপ্লাবিক সংগঠনের সূত্র ও তেমনি বাইরে থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'ল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ সেই কাজের জন্য উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হ'ল। কলেজের ছাত্রাবাসে এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে দেখতে নানা রকম সমিতি এবং সংঙ্ঘ গড়ে উঠলো কিন্তু বিদেশী সরকারও তো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। নানা রকম দমন পীড়নের আয়ুধ হস্তে তারাও এগিয়ে এল। নতুন নতুন সার্কুলার এবং আইনের পর আইন জারী করে সরকার যতই কঠোর হ'তে কঠোরতর হ'তে লাগল, ছাত্র এবং তরুণদের মধ্যে ততই যেন আইন ভঙ্গ করার এবং বিদ্রোহের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এ যেন সেই কবির ভাষায়—"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে তত মোদের বাঁধন টুট্‌বে, ওদের আঁখি যত রক্ত হবে তত মোদের আঁখি ফুটবে।"

কিন্তু দেশের তেমন একটা দুর্যোগের সময়েও পুলিশ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের গায়ে হাত দিতে পারেনি; তার অন্যতম কারণ হিসাবে বলতে গিয়ে অগ্নিযুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী এবং কৃষ্ণনাথ কলেজেরই-প্রাক্তন ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার তাঁর স্মৃতি চারনায় বলেছেন—"ইহার মূল কারণ ছিল এক ইঙ্গ-বঙ্গীয় শিক্ষাব্রতীর অত্যাশ্চর্য্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব। কৃষ্ণনাথ কলেজের সৌভাগ্যক্রমে রেভারেণ্ড এডোয়ার্ড মনোমোহিনী হুইলার তখন ইহার অধ্যক্ষ। হাস্য-

পরিহাসে সরস, বিদ্যাবত্তায় ও মনীষায় ভাস্বর, সংযত, পুতচরিত্র এই লোকটির হৃদয়ে ছিল ছাত্রপ্রীতির অফুরন্ত উৎস। অপর পক্ষে চরিত্র মাধুর্য্য এবং সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের ফলে তখনকার স্থানীয় ইংরেজ মহল এবং শাসক মহলে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও তাঁহার কলেজের ছাত্রদের গায়ে সরকারী দমননীতির সামান্যতম আঁচও লাগিতে পাইত না, তাঁহার নির্ভয় নিঃশঙ্ক আশ্রয়ছায়াতলে থাকিয়া কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র সমাজ সেদিন যে ভাবে প্রাণ ভরিয়া দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তাহার জোড়া মিলিবে না। কেবলমাত্র প্রকাশ্য আন্দোলনই নয় ইহার পর কলেজের ছাত্ররা যখন গুপ্ত সমিতি গড়িয়া দেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তখনও অকৃত্রিম ছাত্র-বন্ধুটির আন্তরিক সহানুভূতি এবং সক্রিয় সাহায্যলাভে তাহারা বঞ্চিত হয় নাই। বৃটিশ সরকারের দেশব্যাপী ছাত্র নিগ্রহের উদ্যত ফণা কৃষ্ণনাথ কলেজের দিকে মুখ করিয়া হুইলারের ছাত্রপ্রীতির সুমধুর নিঃস্বনে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।" ওদিকে তখন দেশ জুড়ে দমন-পীড়নের নির্মম আঘাত শুরু হয়ে গিয়েছে। কাগজে রাজদ্রোহ, প্রচারের দায়ে ব্রাহ্মবান্ধব, অরবিন্দ ও যুগান্তর দল একে একে অভিযুক্ত হ'তে লাগল। বিপিন পাল 'বন্দেমাতর'-এর মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে জেলে গেলেন। সভা-অনুষ্ঠান রেগুলেশন লাঠির জোরে বন্ধ হ'তে লাগল। নেতাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন, খবরের কাগজ প্রেস আইনের খপ্পরে পড়ে গেল ও সঙ্ঘ-সমিতির কর্মীদের পেছনে গোয়েন্দা লাগল, সমিতির কার্য্যালয়গুলি বার বার পুলিশের হামলায় বিব্রত হ'ল এবং শেষ পর্য্যন্ত বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় অনেক সংগঠন উঠেই গেল। যেগুলি অবশিষ্ট রইলো সেগুলি বাইরের কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধ করে গোপনে কাজ করতে লাগল। 'যুগান্তর' 'অনুশীলন' 'আত্মোন্নতি সমিতি' এইভাবে গুপ্ত সমিতিতিতে পরিণত হ'ল। ক্রমে

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ বিপ্লবীদের একটি শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হতে থাকল। এই কলেজের অধ্যাপনার খ্যাতিও তখন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ থেকে দলে দলে ছাত্ররা এসে এই কলেজে ভর্তি হচ্ছেন, অনেকে গুপ্ত সমিতির বার্তা ও বহন করে আনছেন। সে সময়ে 'বন্দেমাতরম সমিতি,' 'সুহৃদ সমিতি', বিশেষ করে 'যুগান্তর' দলের কর্মীরা এই কলেজে এসে দল গঠনের কাজে ব্রতী হন। পরে 'অনুশীলন সমিতি' ও কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দলবৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা তখন থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। ব্যায়াম চর্চার আখড়াগুলি ছিল প্রকাশ্য এবং যোগা-যোগের কেন্দ্র বিশেষ, কিন্তু তার আড়ালে গোপনে চলত অস্ত্র চালনা শিক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ। মুর্শিদাবাদ ইমামবাড়ি থেকে কতগুলি ভাল ছোরা ও তলোয়ার বিশেষ উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং শোনা যায় যে নবাব প্যালেসের হাজার দুয়ারীর অস্ত্রগার থেকেও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র গোপনে পাচার করার চেষ্টা হয়। সে সব ছোরা এবং তলোয়ার সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি ব্যায়াম চর্চার আখড়াগুলিতে দুটি একটি করে বিলি করা হয়। বিপ্লবী যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার তাঁর স্মৃতি-চারনায় বলেছেন, "কৃষ্ণনাথ স্কুল এবং কলেজের যে সকল ছাত্র চল্লিশ বৎসর ব্যাপী ভারতের বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামে স্বেচ্ছা সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, ত্যাগ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া যাহারা অন্তরীণ ও বারম্বার কারারুদ্ধ হইয়া দারিদ্রবরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ডাঃ সৌরেন মুখার্জী প্রমথ রায়, অমূল্য গাঙ্গুলী, রুদ্র নারায়ন রায়, শরদিন্দু রায়, বরদা মজুমদার, যোগেন সরকার, অবিনাশ রায়, সৌরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ গুহ, নিখিল গুহরায়, কেদার সান্ন্যাল, ভূপেন সেন, জিতেন লাহিড়ী, মহেন্দ্র সান্ন্যাল, অতুল যোষ, নিশীথ বসু সর্বাধিকারী, গৌরী সরকার, সুপতি নাগ, সতীশ চক্রবর্তী, রাজেন পাল, সাবিত্রী

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন নাগ, ফনী দুবে, হরেন ভট্টাচার্য, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিনমোহন সিংহ, প্রমথ সরকার, চারু বন্দ্যোপাধ্যার প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এঁদের কেউ কেউ মুর্শিদাবাদ জেলার বাইরে থেকে পড়া-শুনা করার জন্য কৃষ্ণনাথ কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। আজ অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল পরে তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু নিখিল রায়, অমূল্য গাঙ্গুলী, নিশীথনাথ বসু সর্বাধিকারী প্রভৃতি অনেকে পরবর্তী কালেও এই জেলার বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকে ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁদের কথা পরে বিশ্লিষ্ট করে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো। কিন্তু তার পর এবং আরও পরে আরো ছাত্র, আরো বিপ্লবী ঐ কলেজকে কেন্দ্র করে একের পর এক এসেছেন। তাঁদের মধ্যে শহীদ নলিনী বাগচী, সূর্য্য সেন, নিরঞ্জন সেনের নাম বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মান সরকারের সহযোগিতায় ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের যে পরিকল্পনা করা হয়, যা নানা কারণে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়, কিন্তু সেই সূত্রে ১৯১৬ সালে তিন হাজারেরও বেশী মানুষ যারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং কারারুদ্ধ ও অন্তরীন হন, তাঁদের মধ্যে শতাধিক ছিলেন এই বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের তৎকালীন ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্র।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান

কিন্তু মানুষ গড়ার কাজে, বিশেষ করে ছেলেদের চরিত্র গঠন করার কাজে সে সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের অবদানের কথাও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে

স্মরণ করতেই হবে। স্বীকার করতেই হবে, বাংলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলে আছে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী, যা মানুষের আত্মাকেও ডেকেছে, শুধু আঙ্গুলকে নয়। দুর্বল, ভীরু, পরাধীন জাতির সম্মুখে তিনিই তো প্রথম বল্লেন,—"শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মরণ, শক্তিই সুখ, দুর্বলতাই দুঃখ, শক্তিই পুণ্য দুর্বলতাই পাপ।"

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কয়েক বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ বহরমপুরের অদূরে সারগাছিতে কেমন করে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ সে সময়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের যুবকদের নানাভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এক সময়ে বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবই বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে চালাচ্ছেন।" তাঁকে যখন বোমার মামলায় গ্রেপ্তার করা হ'ল, তখন তাঁর ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মাটিও পাওয়া গিয়েছিল। সেই মাটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর কারা কাহিনীতে লিখেছিলেন, "ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে অনেক্ষণ নিরীক্ষণ করেন। তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজ বিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা মাটি ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিবেকানন্দ সে যুগে বিপ্লবী বাংলার প্রেরণা ও শক্তির উৎস ছিল, সে কথা হয়তো বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন নেই। ছাত্রদের মুখে মুখে তখন স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হ'ত—"Freedom, oh freeeom is the Cry of life, Freedom, oh freedom is the song of the soul,

বহরমপুর থেকে ছাত্ররা দলে দলে সারগাছি যেতেন অখণ্ডানন্দের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনবার জন্য। তারা গিয়ে অনেক সময় স্বামী অখণ্ডানন্দকে বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধক ও জনসেবার আদর্শ বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করতেন। অখণ্ডানন্দ ও স্বামীজীর বিশেষ বিশেষ বাণী তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে যেতেন। তাতে ছেলেরা যথেষ্ট প্রেরণালাভ করতেন। অখণ্ডানন্দের উদ্‌যোগেই কেমন করে বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়েছিল সে কথা অখণ্ডানন্দের জবানীতেই শুনুন। অখণ্ডানন্দ বলছেন,—"যতীন্দ্রনাথের তখন বয়স অল্প, আঠার-উনিশ হবে আমার সাথে খুবই বন্ধুত্ব। নরেনকে তার কথা মাঝে মাঝে বলতাম........সে একদিন যতীনকে দেখতে চাইল। আমি নরেনের সাথে যতীনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। সে সময়ে বাংলা সরকার স্বামীজীকে ভাল চোখে দেখত না। আমি যতীনকে নিয়ে এলাম। স্বামীজীর সাথে কালী মহারাজ ছিল। স্বামীজী একটা চৌকিতে আধশোয়া হয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। যতীন ঘরে ঢুকতেই তিনি আলবোলার নলটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন। চেয়ে রইলেন চোখের দিকে। সেদিন সেই সময় মনে হ'ল যেন আগুন আগুনকে গিলে খাচ্ছে। আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। কালীও বেড়িয়ে এসেছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁদের কি যে কথা হ'ল। স্বামীজী দরজা খুলে তাকে নিয়ে বাইরে এলেন। যতীনের কাঁধের ওপরে বাঁ হাতটা রেখে বললেন, আত্মীয়তাটা যেন মাঝে মাঝে দেখা করে বজায় রেখ। বলেই হেসে ঠাট্টা করলেন, জানইত মানুষের কটুম আসতে যেতে?...... যতীন তারপর প্রায়ই আসত, কিন্তু কি যে কথা হ'ত; জানতে পারিনি।"

প্রথম মহাযুদ্ধের ঘনান্ধকারে

ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বৃটিশ শক্তি জার্মানের আক্রমনে তখন পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। বিপ্লবীরা ঠিক করলেন ১৯১৫ সালে দেশব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রশক্তি দখল করা হবে। জার্মানী ভারতীয় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে সৈন্য পরিচালক এবং টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেল। বাঙ্গালী বিপ্লবীরা কাশী, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী দল গঠন করলেন। আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়দের 'গদর পার্টি' নামে এক শক্তিশালী দল ছিল। ঐ দলের বেশীর ভাগই ছিল পাঞ্জাবী। 'গদর' কথার অর্থ বিদ্রোহী। গদর দল শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয়, জাপান, জার্মানী ও আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়রাও বিদ্রোহের আয়োজনে যোগ দিল। দলে দলে পাঞ্জাবীরা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরতে লাগল। দেশীয় নৌ ও স্থল সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ সংক্রামিত করা হ'ল। ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে এক সশস্ত্র গদর 'কোমা-গাতামারু' নামে জাহাজে ভাঙ্কুভার থেকে কোলকাতার দিকে যাত্রা করল। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস বলছে, এই একটা সময়েই 'যুগান্তর' 'অনুশীলন' সমিতি ও অন্যান্য গুপ্ত সমিতিগুলি বাঘা যতীনকে এই সংগ্রান পরিচালার নেতা বলে মেনে নিল। জাপান প্রবাসী রাসবিহারী বসু, উপনিবেশীয় ভারতীয়দের যোগাযোগ রক্ষক ও পরিচালক হলেন। সেই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সে সময়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের তৎকালীন এবং প্রাক্তন বিপ্লবী ছাত্রদের অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জীতেন লাহিড়ী, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী এবং যোগেন দে সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাক্তন ছাত্র জীতেন লাহিড়ীই ইউরোপ

থেকে জার্মান সাহায্যের কথা জেনে এসে বিপ্লবীদের খবর দেয়। যারা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাবার ভার নেন, অতুল ঘোষ ছিলেন তাঁদের একজন। সতীশ চক্রবর্তীর ওপরে অজয়ের পুল উড়িয়ে দেওয়ার এবং ই-আই-আর লাইন অচল করে দেওয়ার ভার অর্পিত হয়। যোগেন দে সরকার উত্তর বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঠিক হয় যে, বহরমপুরের বিপ্লবী ছাত্ররা বহরমপুরের পথে রাজসাহীতে অস্ত্র পাঠাবে, সময় মত মুর্শিদাবাদ জেলার শহরগুলি দখল করবেন, রাজশাহীর ভেতর দিয়ে উত্তর বাংলার সঙ্গে যোগা-যোগ এবং ঐ অঞ্চলের ই-বি-আর লাইনগুলি রক্ষা করবে।

ফারাসী গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহের আয়োজনের খবর পেয়ে ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দেয়। এদিকে 'ম্যাভেরিক' ও 'অনিলার সেন' প্রভৃতি যে সব জাহাজের জার্মানী প্রেরিত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসার কথা ছিল, সেগুলি সময়মত পৌছতে পারল না এবং পথের মধ্যেই আটক পড়ে গেল। ইতিহাসে লেখা আছে বাংলার বিপ্লবীদের সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থতার পাশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে বাঘাযতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন এবং যতীশের বীরত্ব গাঁথা আর সেই গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গেও যে বহরমপুরের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে, তাকে অস্বীকার করবে কে ?

নব ভারতের হলদিঘাট

রাসবিহারীর পর বাংলার বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব যখন যতীন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত, তখন রাজনৈতিক আকাশে আলোর চিহ্ন মাত্র দৃষ্টি গোচর হ'চ্ছেনা। কিন্তু সে সময় সর্বভারতীয় বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলেও বৃটিশ সভর্নমেণ্ট বুঝেছিল যে, যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে এই নির্বানোন্মুখ

আগুন আবার প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে; সুতরাং বাঘাযতীনকে তাদের চাই। গোয়েন্দা পুলিশের বেড়া জাল দিনে দিনে ঘন হয়ে আসছে দেখে যতীন্দ্রনাথ ও বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি সে সময়ে কোলকাতার অদূরে বাগনানে ঐ স্কুলের হেডমাস্টার অতুল সেনের বাড়ীতে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, অতুল সেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র এবং যতীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁদের ওড়িশা অভিমুখে যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে যখন তা জানা-জানি হয়ে যায়, তখন তাঁকে পুলিশের হাতে প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

গুপ্তচরের দল যখন সংবাদ পেয়ে গেল যে যতীন্দ্রনাথ চিত্তপ্রিয় নীরেন, মনোরঞ্জন ও যতীশ এই চারজন বিশ্বস্ত বিপ্লবী সহচর সঙ্গে নিয়ে ওড়িশা অভিমুখে যাত্রা করেছেন, তখন টেগার্টের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও সেই দিকেই অগ্রসর হ'ল। যতীন্দ্রনাথ যত এগিয়ে যান, পুলিশ বাহিনীও তত তাঁদের পশ্চাৎধাবণ করে। বালেশ্বরের সীমান্ত পার হয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন ময়ুর-ভঞ্জের গভীর অরণ্যময় অঞ্চলে। একের পর এক পার্বত্য নদী এসে তাঁদের পথরোধ করল। বন্দুক পিস্তল, কার্তুজ বাঁচিয়ে তাঁরা কোথাও নৌকায়, কোথাও সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে যান, অবশেষে তাঁরা প্রবেশ করলেন চাষখণ্ডের গভীর জঙ্গলে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী ও ছুটেছে পেছনে। অবশেষে চাষখণ্ডেই দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বেধে গেল। একদিকে সশস্ত্র বিরাট এক পুলিশ বাহিনী, হাতে তাদের দূর পাল্লার আগ্নেয় অস্ত্র, আর একদিকে কম পাল্লার গুটি কয়েক পিস্তল এবং রিভলভার মাত্র সম্বল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের সেই যুদ্ধ কৌশলের সঙ্গে টেগার্ট তুলনা করেছিলেন—ওয়াটারলু রণ কৌশলের। বাঙ্গালী কবি বলেছেন, 'নব ভারতের হলদিঘাট'।

ইতিহাস বলছে, বালেশ্বরের খণ্ড যুদ্ধে বিপ্লবীদের গুলিতে অনেক পুলিশ নিহত হয়েছিল; আর পুলিশের প্রথম গুলি চিত্তপ্রিয়ের বুকে এসে লেগেছিল। চিত্তপ্রিয় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেদিকে দৃষ্টি ফেরা মাত্র একটি গুলি এসে যতীন্দ্রনাথের উরুতে বিদ্ধ হ'ল। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। অজস্রধারায় গুলিবর্ষণ করে চলেছেন শত্রুসৈন্য লক্ষ্য করে। ওদিকে আহত চিত্তপ্রিয়ের বুকের ক্ষতস্থান দিয়ে তখন প্রবল বেগে রক্ত ঝরে পড়ছে। সে দৃশ্য দেখে যতীন্দ্রনাথ যেই না উদ্যত হয়েছেন একটা কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে সেই ক্ষতস্থান বাঁধার জন্য, অমনি একটি বুলেট এসে তাঁর তলপেটে বিদ্ধ করল। নিদারুণ সে আঘাতে বীরের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নীরেন এবং যতীশ ও তখন আহত হয়েছে কিন্তু তাদের আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

অবস্থা বুঝে যতীন্দ্রনাথ শান্তির শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাদা নিশান দেখে পুলিশবাহিনী সতর্ক পদে অগ্রসর হ'ল পতাকা লক্ষ্য করে। যুদ্ধভূমিতে তারা যখন এসে পৌঁছল, চিত্ত-প্রিয়ের অমর আত্মা তখন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অল্প আহত মনোরঞ্জন ও নীরেনকে থানায় চালান দেওয়া হ'ল এবং চিত্তপ্রিয়, যতীশ ও যতীন্দ্রনাথকে তিনখানি খাটিয়ায় তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল বালেশ্বরের হাসপাতালে। পরেরদিন হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের নয়ন চিরনিদ্রায় নিমিলিত হ'ল।

ইতিহাস বলছে, একটা বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল জীবিত বাকি তিনজন বিপ্লবীর বিচারের জন্য। বলা বহুল্য ট্রাইবুনাল তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে। নীরেন ও মনোরঞ্জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যতীশকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড। জেলখানায় যতীশ পাগল হয়ে গিয়েছিল। এই বহরমপুর পাগলা গারদেই যতীশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিছুদিন আগে বালেশ্বরের সেই তীর্থক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম।

দেখে এলাম সেই হাসপাতালটি যেখানে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের প্রাণবায়ু শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালটি এখন আর হাসপাতাল নেই, সেটি এখন একটি মেয়েদের স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সেই দালান সেই ঘর ঠিক তেমনি আছে। সম্মুখের উদ্যানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী বাঘাযতীনের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে এসেছেন; আর দেওয়ালের গায়ে পাথরের ফলকে লেখা হয়েছে বালেশ্বরের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সেদিন শীতের হিমেল এক সন্ধ্যায় বালেশ্বরের কর্মরত রেল কর্মচারী একটি তরুণের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম পুষ্প উদ্যানে বাঘা যতীনের মূর্তির সম্মুখে। মনটা চলে গিয়েছিল ১৯১৫ সালের এক অশ্রুসজল সন্ধ্যায়। মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে শুয়ে আছেন হাসপাতালের ঔদাসীন্যের খাটিয়ায়। পাশের খাটিয়ায় আহত সহযোদ্ধা যতীশ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। অপর সহযোদ্ধা মনোরঞ্জন এবং নীরেনকে থানায় চালান দেওয়া হয়েছে। ঘটনার প্রায় আঠান্ন বছর পরে সেদিন বালেশ্বরের সেই একদা হাসপাতাল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যেন বিপ্লবী বীরের সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে পুলিশবাহিনীর অধিনায়ক চার্লস্ টেগার্টকে সম্বোধন করে নেতা যতীন্দ্রনাথ বলছেন —"পুলিশকে লক্ষ্য করে যতগুলি ছোঁড়া হয়েছে, তার জন্য একান্তভাবে দায়ী আমি এবং আমার সহকর্মী চিত্তপ্রিয়। অতএব সে কাজের দায়িত্ব যেন ঐ ছেলে দুটির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের দণ্ডিত ও নির্যাতিত করা না হয়।" ইতিহাস বলছে, মৃত্যুগমনোন্মুখ বিপ্লবীর সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি।

শত্রু চার্লস্ টেগার্ট ও শেষ পর্যন্ত শহীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে সম্মান না দেখিয়ে পারেনি। নেতা যতীন মুখার্জী

সম্বন্ধে টেগার্ট বলেছিলেন—"যতীন্দ্রনাথ যদি পাশ্চাত্যর কোন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলে সমগ্র মানব জাতির সামনে তিনি রেখে যেতেন বিরাট কীর্তি, অপার্থিব আদর্শ।"

সূর্য্য সেন উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বাংলার যুবশক্তিকে যতীন্দ্রনাথের আদর্শে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র আক্ষেপ করলেন কোহিমা ফ্রণ্টে—"আজ যদি যতীনদা থাকতেন।"

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—যতীন মুখার্জীর নাম শুনেছো? অভিনব ব্যক্তি! মানবতার পুরোভাগে যাদের স্থান, সে ছিল তাদেরই অন্যতম। এমন শক্তি ও সৌন্দর্যের সমন্বয় আর দেখিনি। তার চেহারাই ছিল যোদ্ধার মত।"

বুড়ীবালাম নদী আজও তেমনি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপাড়ের অরণ্যরাজীর পানে অনেক্ষণ চেয়ে-ছিলাম। দুটি মূর্তি চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। একটি ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ আর তারই পাশে বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর তেজস্বী মুর্তি।

বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ একটা যোগসূত্র ছিল। তিনি বহুবার এই জেলায় এসেছেন এবং এই জেলার বিপ্লবীদের প্রেরণা দান করেছেন। বালেশ্বরে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকজন লালবাগে এসে বসবাস করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, ভারতের বহু খ্যাতনামা বিপ্লবীদের নিঃশব্দ আনাগোনায় মুর্শিদাবাদ তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কথিত আছে, ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবী যাদুকর রাসবিহারী বসুও এক সময়ে এই বহরমপুরে এসেছিলেন এবং কৃষ্ণনাথ কলেজের একটি ছাত্রাবাসে আত্মগোপন করেছিলেন। পুলিশ সেই খবর জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাধারঘাটে নদী পার হয়ে চলে যান।

শহীদ নলিনী বাগচী
মুর্শিদাবাদের গৌরব

বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধের পর ১৯১৭ সালের সরকারী চণ্ডনীতি এমন একরূপ পরিগ্রহ করল যে, বাংলার বিপ্লবীদের সংগঠন এবং অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তখন নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পুলিশের গ্রেপ্তার এবং তল্লাসীর বেড়াজাল এড়াবার জন্য তাঁদেরকে প্রয়োজন বোধে সে সময়ে বাংলার বাইরে গিয়ে থাকতে হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র নলিনী বাগচীরও বহরমপুর কলেজে পড়াশুনা করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হ'ল না। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য প্রথমে ভাগলপুর ও পরে বাঁকিপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরো পুরিভাবেই তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। তাঁর জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলার সঙ্গে ও তার পর থেকে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে নলিনী বাগচী ও বাংলাদেশ ছেড়ে আসামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

আসাম তখন খানিকটা নিরাপদ জায়গা বলেই বিবেচিত হ'ত; কারণ বাংলা দেশের বিপ্লব আন্দোলনের ঢেউ তখন আসামে গিয়ে পৌঁছেনি ফলে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি তখনও আসামে গিয়ে পড়েনি। পলাতক বিপ্লবীদের অজ্ঞাতবাসের পক্ষে আসাম সেই দিক থেকে বেশ অনুকূল ছিল।

বাংলার পলাতক বিপ্লবীরা গৌহাটি শহরের এক প্রান্তে তাঁদের একটি গোপন আস্তানা স্থাপন করলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তাঁরা দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথক বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দলের নেতারা তখন প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ এবং

সরকারী চণ্ডনীতি ও অমানুষিক দমন-পীড়নে বিপ্লবী সংগঠনগুলি ও তখন প্রায় ছত্র ভঙ্গ অবস্থায়। সংগঠনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব তখন বাইরে যারা আছেন তাঁদের ওপরে। দায়িত্বশীল কর্মীরা আত্মগোপন করে থেকে সেই গুরু দায়িত্ব পালনে মনঃসংযোগ করলেন। নলিনী বাগচী এবং তাঁর সহকর্মীরা আসামের গোপন আস্তানায় থেকে বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু একদিন গোয়েন্দা বাহিনী তা জেনে ফেলল এবং পুলিশ তাঁদের গোপন আস্তানা ঘেরাও করে ফেলল। দেখতে দেখতে ছু'পক্ষের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল তুমুল সংগ্রাম। কিন্তু যে যুদ্ধের একদিকে রাইফেল ও বন্দুকধারী বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং অপর দিকে রিভলভার ও পিস্তল সম্বল গুটি কয়েক যুবক মাত্র, সে যুদ্ধ তো বেশিক্ষণ চলতে পারে না। কিন্তু তবু মৃত্যুভয়হীন বে-পরোয়া বিপ্লবীরা অবিশ্রান্ত গুলি চালিয়ে চলেছেন। সে অনলবৃষ্টি উপেক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার মত সাহস আর যারই থাকুক না কেন, বেতনভূক পুলিশ বাহিনীর ছিল না; কিন্তু বিপ্লবীদের গুলিবারুদ তো সীমিত: সুতরাং তা শেষ হয়ে যেতে বেশী সময় লাগল না। বিপ্লবীদের আগ্নেয় অস্ত্রগুলি যখন ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে এসেছে, পুলিশবাহিনী তখন অতি সন্তর্পণে পা পা করে এগিয়ে চলল তাদের আস্তানা অভিমুখে। ধীরে ধীরে দরজার খুব কাছে যখন পৌঁচেছে, তখনও ভয় কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছেন না। পুলিসের বড় কর্তা ফেয়ারওয়েদার সাহেব বীর দর্পে চীৎকার করে উঠলেন—"দরজা খোল।" ভেতর থেকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এলো, "দরজা খোলাই আছে, মরতে হয়তো ভেতরে পা বাড়াও।" স্তম্ভিত পুলিশবাহিনী নিশ্চল। বিপ্লবীরা পুলিশের এই ভীত সন্ত্রস্ত এবং দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেদের পালাবার পথ প্রশস্ত করে নিল।

ঘটনার ইতিহাস বলছে, শেষ পর্যন্ত পাঁচজন আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। কিন্তু পুলিশের সেই ছুর্ভেদ্য বেড়াজাল

ভেদ করে দু'জন বিপ্লবী পালাতে সমর্থ হলেন, নলিনী বাগচী তাঁদের অন্যতম। এঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে হাঁটা পথে কোলকাতা রওনা হন।

পথ দুর্গম, শ্বাপদ সঙ্কুল পাহাড়ের অরণ্য পথ। কিন্তু দেশের জন্য যারা সব দিয়েছে, দেশের রাজপথ তো তাঁদের কাছে চিরদিনই রুদ্ধ। দুর্গম-দুরতিক্রমনীয় পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়েই তো তাদের চলতে হয়েছে; খেয়াঘাটের খেয়া নৌকা তো কোনদিন তাদের পার করে দেয়নি, সাঁতার দিয়েই তো পদ্মা পার হ'তে হয়েছে। কারাগার তো তাদেরকে মনে করেই প্রথম নির্মিত হয়েছিল, শৃঙ্খল সে তো তাদের অলঙ্কার। দুঃখের দুঃসহ গুরুভার তাঁরা বইতে পারেন বলেই তো বিধাতা তাঁদের স্কন্ধে যত দুঃখের বোঝা অর্পন করেন। পরাধীন দেশের রাজদ্রোহী বীর নলিনী বাগচী হাঁটা পথে, ঘোরা, পথে জটিল এবং কুটিল পথে কোলকাতায় এসে যখন পৌছলেন তখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। সারা গায়ে গুটি বসন্ত বের হয়েছে। জ্বরে একেবারে বেহুস অবস্থায় একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে কোলকাতার গড়েরমাঠে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইলেন। কিন্তু বীরের মৃত্যু যার জন্য অপেক্ষা করছে, তিনি তো রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে অথবা পথে পড়ে মরতে পারেন না। বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র পাকৃরাশী দূর থেকে দেখতে পেয়ে চিনে ফেললেন নলিনীকে। তিনি তাঁকে বুকে নিয়ে গোপন আস্তানা অভিমুখে রওনা হ'লেন। সেবা এবং পরিচর্য্যায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু আগুনের পরশমণি যার প্রাণস্পর্শ করেছে, ভারতের মুক্তি, ভারতের স্বাধীনতা যার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন সে তো চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। সেই রুদ্র দেবতার উদ্দেশেই তো কবি বলেছেন—"তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,

দিবা-নিশি তাইতো বাজে, পরাণ মাঝে
এমন কঠিন সুর।"

ছিন্ন-ভিন্ন সংগঠনকে গুছিয়ে তুলে শত্রুকে আঘাত করতে হবে।

অর্থ চাই, অস্ত্র চাই, চাই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অজস্র সমার্পিত প্রাণ যুবক। নলিনী তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা ভুলে গিয়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে তিনি ঢাকার কলতাবাজারে একটা গোপন আস্তানা গড়ে তুললেন। বিপ্লবী তারিণী মজুমদারও গিয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই গোপন আস্তানার কথা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে বেশীদিন গোপন রইল না। কিছুদিন পর্য্যবেক্ষণের পর একদিন রাত্রিতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বাড়ীটাকে ঘেরাও করে ফেলল। নলিনী এবং তারিণী যখন বুঝতে পারল যে, পালাবার চেষ্টা করা বৃথা, সকল পথই অবরুদ্ধ; তখন স্থির হ'ল গুলির মুখে পথ করে বেড়িয়ে যেতে হবে। দরজা খুলে বের হ'তে গিয়ে দেখলেন সামনেই এক হাবিলদার দাঁড়িয়ে। বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে তৎক্ষণাৎ সে লুটিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু আবেষ্টনকারী সমগ্র পুলিশ বাহিনীর রাইফেল এক সঙ্গে গর্জে উঠলো বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে তারিণী মজুমদারের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল বাড়ীর সামনে। নলিনী ক্ষিপ্রহস্তে দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে গেলেন এবং শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। একদিকে নিঃসঙ্গ নলিনী বাগচী আর অন্যদিকে বিশাল এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ইতিহাসে সেই যুদ্ধের কোন তুলনা আছে কিনা, তা জানি না। কিন্তু অসম সাহসিকতা ও অদম্য উৎসাহের সঙ্গে নলিনী একক সেদিন যে সংগ্রাম করেছিলেন ইতিহাস বলছে, তাতে একের পর এক শত্রুপক্ষের অনেকেই ধরাশায়ী হয়েছিল। নলিনীর সারা দেহে গুলিবিদ্ধ, রক্তাক্ত, কিন্তু তবু ভ্রূক্ষেপ নাই, অগ্নিবৃষ্টি করে চলেছেন তিনি। সে গুলিবর্ষণ থামল তখন, যখন তাঁর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। চরম এবং পরম আকাঙ্খিত বীরের মৃত্যু তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। পুলিশবাহিনী ততক্ষণে শঙ্কিত পদক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করলো। নলিনী মেঝের ওপরে পড়ে রয়েছে, সর্বাঙ্গে খুনের আবির; কিন্তু পিস্তলটি তখনও হাতের বজ্রমুষ্টিতে ধরে

রয়েছেন। সেই অর্দ্ধ অচেতন অবস্থাতেই পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখন পর্য্যন্ত তার প্রকৃত পরিচয় পুলিশ জানে না। কিন্তু সময় যে বয়ে যাচ্ছে, পুলিশকে যে জানতেই হবে তার নাম, ধাম। তাই মৃত্যু পথ যাত্রী সেই বীর বিপ্লবীকে তারা মহূর্ত বিশ্রাম দিতে রাজী নয়। সেই অবস্থাতেই প্রলোভন এবং নির্য্যাতন এক সঙ্গেই চলতে লাগলো। কিন্তু নলিনী কি জানতো না যে, তাঁর নামটা প্রকাশ করে গেলে ইতিহাসের পাতায় তা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে? কিন্তু ইতিহাসে হয়তো এমন কতগুলি মুহূর্ত আসে যখন বিপ্লবীকে নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। নাম নয়, খ্যাতি নয়, যশ নয়, চোখের জল নয়, গৌরব গাঁথারও কোন প্রয়োজন নেই; শুধু কর্ত্তব্য শেষ করে বীরের মৃত্যুই তার আকাঙ্খা। বিপ্লবী নলিনী বাগচীও চাননি, কেউ তাঁর নাম জানুক, অথবা তার জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলুক। তাই তাঁর মুখ থেকে দুটি কথাই শুধু বের হয়ে এসেছিল—"Let me die in Peace, Don't disturb me." শান্তিতে মরতে দাও, বিরক্ত কোর না।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে হাসপাতালে বিপ্লবী নলিনী বাগচী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। হিসেব মত তেপান্ন বছর পার হয়ে গিয়েছে। পরাধীন ভারতে এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই শহীদ নলিনী বাগচী স্মৃতি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেদিন প্রকাশ্যে সেই বীর বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়তো অনেকে সাহস পেতেন না। এখন আর সে ভয় নাই। ১৯৭৪ সালের ৬ই এপ্রিল শহীদ নলিনী বাগচী স্মৃতি রক্ষা কমিটি বহরমপুরে তাঁর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সূত্র ধরে এইখানে জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তুতি সম্বন্ধে দুটো কথা বলা প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি, কারণ জেলার সদর বহরমপুরে যখন কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি পুরোদমে চলছিল, তখন জেলার

অন্যান্য মহকুমাগুলিও নিরুত্তাপ ছিল না। বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার তাঁর স্মৃতিচারণায় যা বলেছেন, তা থেকে জানা যায়, কাশী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী গোপেশচন্দ্র রায় কোন সূত্রধরে এবং কেমন ক'বে জঙ্গীপুরে এসেছিলেন, সে খবর জানা না গেলে ও গোপেশচন্দ্র রায়কে ধরার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে তখন কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, সে কথা পরে জানা যায়। তিনি এসে প্রথমে নলিনীকান্ত সবকার এবং আরও কয়েকজনকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ক্রমে নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, পাকুড়, রামপুরহাট প্রভৃতি বিস্তির্ণ অঞ্চলের স্কুলগুলিতে ছাত্রদেব মধ্যে বিপ্লব আন্দোলনের বাণী প্রচাব করে তাদের দলে টানা হতে লাগল। জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও সশস্ত্র বিপ্লবেব প্রস্তুতি জোর কদমে চলতে লাগল। বাঘা যতীন একবার জঙ্গীপুব মহকুমাব মিঠিপুরে গিয়েছিলেন গোপন বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মহকুমার ছেলেদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। নলিনীকান্ত সরকাব এবং আবও দু'একজনকে কেন্দ্র করে তখন জঙ্গীপুব মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনেব কাজ বিস্তার লাভ করেছে এবং বাইরে থেকে নামকবা সব বিপ্লবীদের নিঃশব্দ আনা-গোনায় মহকুমার গ্রাম এবং শহর মুখর হয়ে উঠেছিল বলা চলে। অবশেষে একদিন পুলিশ সজাগ হ'ল এবং রঘুনাথগঞ্জে বিপ্লবীদের একটি গোপন ঘাঁটি ঘেরাও করে ফেলল। বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। অবশেষে পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ভেতবে ঢুকে দেখল, সেই বাড়ীতে কোন লোকই নাই অর্থাৎ যারা ছিলেন, তাঁরা কখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন। বহিরাগত যারা সেই বাড়ীতে ছিলেন, তাঁরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বারো-চোদ্দ মাইল পথ হেঁটে যথাক্রমে মুরারই এবং বোখারা স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে কোলকাতা রওনা হয়ে গেলেন ; আর একজন কিছু গোপন প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র নিয়ে রঘুনাথ গঞ্জেই বালিঘাটায় গোপাল দাসের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সে সময়ে'জঙ্গীপুর মহকুমায় গোপন বিপ্লব

আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত হয়ে কাজ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে জঙ্গীপুরের শ্যামাপদ সিংহ, নিমতিতার শ্রীশচন্দ্র সরকার, জগতাই গ্রামের ভগবতীচরণ নিয়োগী, দহরপারের সুকুমার মুখোপাধ্যায়, বেনিয়াগ্রামের কুলেশচন্দ্র মিশ্র ও শৈলেন্দ্রনাথ রায় এবং কাঞ্চনতলার নলিনী বাগচীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নলিনী বাগচী শহীদ হয়েছেন। শহীদ নলিনী বাগচী মুর্শিদাবাদের গৌরব।

আরও বিপ্লবী আরও আত্মদান

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাংলা দেশে কিভাবে গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসার লাভ করল এবং সেই আন্দোলনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অবদান কতটুকু ছিল তা বাঘা যতীন, নলিনী বাগচী প্রভৃতি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছি মাত্র; কিন্তু সেই আলোচনাটুকুই তো সব নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোপনে, নিভৃতে যারা নিজেদেরকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন: বোনেদের ইঁটের মত মাটির নীচে, অন্ধকারে, জলে, কাদায় যারা বুক পেতে দিয়েছেন, যারা গুঁড়ো হয়ে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়ে, স্বাধীনতা সৌধের ইঁটের পর ইঁটগুলিকে ধরে রেখেছেন, তাঁদের কথা ক'জনই বা জানে? অথচ পরাধীনতার সেই জটিল ঘন অন্ধকারের মধ্যে, মাঝে মাঝে তেমন এক একটি চরিত্রের সন্ধান ও তো আমরা পেয়েছি; যা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই দীপ্যমান। কিন্তু তাঁদের সেই দীপ্তিকে ম্লান করে দেবার জন্য, মুছে ফেলে দেবার জন্য ইংরেজ এবং পরবর্তীকালে একশ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ তো কম চেষ্টা করেন নি। তবু তাঁরা আছেন এবং থাকবেন। আমার জেলার ভবিষ্যৎ-বংশধরদের জন্য তাঁদের সেই অলেখা ইতিহাসটুকু লিপিবদ্ধ

করে যাবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ; জানি যুগে যুগে ইতিহাস পুনর্লেখন হয় ; কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে, প্রচারমাত্রই ইতিহাসের সত্য নয়, আর মনুষ্যজাতির গতিও তার দ্বারা নির্ণীত হয় না, কারণ ঘটনার সংঘাতে একদিন আসল চেহারা বের হয়ে পড়ে।

* নিখিল গুহরায়
* অনাদিকান্ত সান্ন্যাল

উপরিউক্ত নাম দুটি মুর্শিদাবাদেব বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। নিখিল গুহরায় এবং তার বিপ্লবী জীবনের অন্যতম সহযোদ্ধা নরেন ঘোষ চৌধুরীর সঙ্গে আমার জেলখানায় পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু অনাদিকান্ত সান্ন্যালকে আমি চোখে দেখিনি, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাঁর কথা শুনেছি মাত্র।

নিখিল গুহ রায় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং কলেজের ছাত্র ও পরে অধ্যাপক স্বর্গত হরেন্দ্র ভট্টাচার্যের সহপাঠী। হরেনদার কাছে শুনেছি নিখিল গুহরায় পড়াশুনায় ভাল ছাত্রই ছিলেন। কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা যাদের জীবনে দুঃসহ হয়ে ওঠে, ঘরের মঙ্গলশঙ্খ, সন্ধ্যার দীপালোক অথবা প্রেয়সীর অশ্রুসজলচোখ তো তাদের জন্য নয়, তাদের জন্য পথে পথে অপেক্ষা করছে কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ, শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ, তাদের জন্য পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফনা, নিন্দা, অপবাদ এবং নির্যাতনই তো তাদের একমাত্র উপহার। নিখিল গুহরায়, নরেন ঘোষ চৌধুরী প্রভৃতি বিপ্লবীদের ভাগ্যেও তাই জুটেছিল।

বৈপ্লবিক প্রস্তুতির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ যোগাবে কে ? সকলেই জানেন যে বিপ্লবীরা সরকারী এবং ধনীদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন

করেই সে অভাব পূরণ করে থাকেন। প্রাগপুর এবং শিবপুর ডাকাতির যে ঘটনা, সেই ঘটনা তেমন একটা প্রচেষ্টা বলা চলে। নিখিল গুহরায়, নরেন ঘোষ চৌধুরী এবং গোরাবাজারের অনাদিকান্ত সান্ন্যালকে সেই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত করে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর প্রমাণ অভাবে অনাদিকান্ত সান্ন্যাল ডাকাতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান বটে, কিন্তু তাঁকে বিশেষ এক ফৌজদারী আইনে আটক করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত রংপুর জেলার শাখাটি থানায় অন্তরীণ করা হয়। অন্তরীণ থাকাকালেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। মুক্তিলাভ করার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি পরাধীন দেশ থেকে চিরমুক্তি লাভ করেন।

মামলার অপর দু'জন আসামী নরেন ঘোষচৌধুরী, নিখিল গুহরায় এবং আরও কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সাজা নিয়ে তাঁরা যখন আন্দামানে যান, দ্বীপান্তরের ঘানিতে তখনও যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক লাগেনি। ছোবরা পেটা, পাথর ভাঙ্গা আর চক্কর ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করা সেদিনের আন্দামান। তৎকালীন অনেক বিপ্লবীর কারা-কাহিনীতেই সেসব কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সে-যুগে বাংলার 'ডেনব্রিন' বলে খ্যাত নরেন ঘোষ চৌধুরী এবং নিখিল গুহরায় সেই কঠোর দণ্ড ভোগ করে আন্দামান থেকে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে বাংলা দেশে নতুন করে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী করা হয়, তাতে প্রথমেই যাদেরকে সেই অর্ডিনান্স বলে গ্রেপ্তার করা হয়, নিখিল গুহরায় এবং নরেন ঘোষ চৌধুরী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী এবং মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী সে যুগের 'হোমাগ্নিপূত প্রাণ' উল্লাসকর দত্ত তখন পাগল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেও গ্রেপ্তার করে গ্রামে অন্তরীণ করা হয়। বিকৃতমস্তিষ্ক উল্লাসকরকে আমি ১৯৩২ সালে আলিপুর

জেলে দেখেছি। অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে সেই উন্মাদ বিপ্লবীকে যেমন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, তেমনি নরেন ঘোষ চৌধুরীকেও সশ্রম কারাদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধ নরেনদা অসুস্থ দেহ নিয়ে বেশীর ভাগ সময়ই জেল হাসপাতালে কাটাতেন। কিন্তু নিখিল গুহরায়কে অন্তরীণ করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার ভরতপুর থানায়। ভরতপুরে অন্তরীণ থাকাকালে কেমন করে তাঁকে কান্দী বোমার মামলায় জড়িত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত আবার আন্দামান পাঠান হয়, সেই কথা বলার আগে বিশেষ একটি কৌতুকপ্রদ এবং অপ্রকাশিত ঘটনার কথা বলতে চাচ্ছি। ভরতপুরে অন্তরীণ থাকাকালে কোলকাতা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ একজন এ. এস. আইকে, ভরতপুরে পাঠায় নিখিলবাবুর উপরে বিশেষভাবে নজর রাখার জন্য। শুনেছি সে নাকি তৎকালীন আই. বি'র সর্বাধিনায়ক রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদারের বিশেষ আস্থাভাজন এবং প্রিয়পাত্র ছিল। নিখিলবাবুর উপরে সেই যুবকটি বিশেষভাবে নজর রাখত। নিখিলবাবু কখনও কখনও যুবকটিকে কাছে ডেকে নিতেন, আদর করতেন, তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্য তাকে খেতে দিতেন। এইভাবে ক্রমে তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং স্নেহে যুবকটি অভিভূত হয়ে পড়ে এবং একদিন অশ্রুসজল নেত্রে নিখিলবাবুকে বলে যে, সে আর পুলিশের কাজ করবে না, সে দেশের কাজ করতে চায়। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় নিখিলবাবু তাকে অনেকভাবে তার সেই সাময়িক উত্তেজনা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সে কোন কথাই শুনতে রাজী হয় না এবং তার বিশ্বস্ততার প্রমাণের জন্য যে কোন দুরূহ কাজ করতে প্রস্তুত বলে জানায়, তখন নিখিলবাবু তাকে যে কাজের ভার দেন, সেই কাজ করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায় এবং অনেক নির্যাতনেও নাকি সে কোন কথা প্রকাশ করেনি। অবশেষে তার তিন বছর সাজা হয়। যুবকটি আর কোলকাতা থেকে ফিরে এল না দেখে

নিখিলবাবুও তার সম্বন্ধে আর কিছু মনে রাখেনি। তখনকার মত ঘটনার যবনিকাপাত সেইখানেই হয়।

উপরিউক্ত ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে, কান্দী বোমার মামলার উদ্ভব হয়। সেই সূত্রে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়, অন্তরীণাবদ্ধ রাজবন্দী বিপ্লবী নিখিল গুহরায়কেও তাতে জড়ান হয়। একজন এপ্রুভার খাড়া করে নিখিলবাবুকে সেই মামলায় জড়িয়ে, আবার তাঁকে আন্দামান পাঠান হয়।

১৯৩২ সালে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে সেই প্রবীণ বিপ্লবীকে প্রথম দেখি; তার পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয় আন্দামান যাওয়ার সময়। বাইরের বিভিন্ন জেল থেকে 'ডেনজারাস' রাজনৈতিক বন্দীদেরকে আনা হচ্ছে আলিপুর জেলে। সেইখানেই ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। ফিট অথবা আনফিট বিচার করবেন জেলের ডাক্তারেরা; তারপর 'মহারাজা' জাহাজে চেপে ডাণ্ডাবেরী পড়া বাংলার বীরবন্দীরা যাবেন আন্দামানে।

যাত্রার আগের দিন তৎকালীন জেল সুপারিন্টেন্ডণ্ট এস. এল. পাটনিকে বলা হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডে এবং সেলে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে কয়েক মিনিটের জন্য হ'লেও একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। জেলার সোয়ান সাহেব এবং সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ভালভাবেই জানতেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের সেই আবেদন উপেক্ষা করলে তার ফল সুদূরপ্রসারী হ'তে পারে। সুতরাং তিনি সে সুযোগ দিয়েছিলেন।

আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে পৌঁছে সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বিয়াল্লিশ বছর আগের সেই ঘটনা মনকে অভিভূত করে তুলেছে। দুপুর বেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং সেলের বন্দীরা একে একে এসে হাজির হ'চ্ছেন 'বোমওয়ার্ডে'। হাজির হ'চ্ছেন বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং অতিবৃদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীরা। তাঁরা সকলেই আন্দামান যাওয়ার জন্য ফিট সার্টিফিকেট পেয়েছেন। ইংরেজ

সরকারের দৃষ্টিতে তাঁরা যে সকলেই 'ডেনজারাস', সুতরাং আনফিটের কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। যুবকটিও এসেছিল সেই মহামিলনে। স্পেশাল ওয়ার্ড থেকে দু'চারজন গান্ধীবাদী নেতাও এসেছিলেন অশ্রুসজল নেত্রে বাংলার বীরবন্দীদের বিদায় দিতে। কে জানে ওরা যদি ফিরে না আসে? পরস্পর পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। হঠাৎ নিখিলদার দৃষ্টি পড়েছে সেই ভীড়ের মধ্যে ম্লানমুখে, অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর সেই যুবকটি। বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূতপ্রায় সেই প্রবীণ বিপ্লবী সেদিন যুবকটিকে বুকে চেপে ধরে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি; পরে নিখিলদা এবং যুবকটির কাছে শুনেছিলাম। যুবকটি বলেছিল, সে যে-কোন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। তা সে হয়েছিল। মার্কসবাদ পাঠের ক্লাসেও সে ছিল একজন ধৈর্যবান ছাত্র।

বিপ্লবী ভূপেশচন্দ্র নাগ কর্তৃক বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত অনাদিকান্ত সান্যালের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। কয়েক বছর আগে উল্লাসকর দত্ত আসামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর কোলকাতার পাতিপুকুর অঞ্চলে বসবাসকারী নরেন ঘোষ চৌধুরী চরম দারিদ্র্য এবং অসহায় অবস্থায় কিছুদিন পূর্বে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৪ সালের তেসরা এপ্রিল কোলকাতায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে আজন্ম বিপ্লবী নিখিল গুহরায়ের ৮৩ বছর বয়সের সংগ্রামী জীবনের অবসান হয়েছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তাঁর অন্যতম সহযোদ্ধা বিপ্লবী অরুণচন্দ্র গুহের কাছে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর চোখ, হাড় এবং মাংস দেশের জন্য দান করে যেতে চান। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিখিল গুহরায়দের সবটাই যে দেশ। দেশের মাটি ওদের দেহের মাংস, দেশের নদ-নদী ওদের দেহের শিরা-উপশিরা 'জননী জন্মভূমি' কথাটা হয়তো ওদেরই কেউ

কোনকালে প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। দেশপাগল, মুক্তিপাগল, আত্মভোলা এই মানুষটিকে বিদেশী সরকার কোনদিনই মুক্ত দুনিয়ায় বিচরণ করতে দেয়নি। বাংলা দেশের অথবা ভারতের কোন বিপ্লবী দু'বার আন্দামানে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেছেন কি না তা জানি না, কিন্তু নিখিল গুহরায়কে দু'বার আন্দামানে যেতে হয়েছিল। ফরিদপুরের ইদিলপুর গ্রামের মানুষ হলেও মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। শেষ জীবনের দিনগুলি তাঁর কেটেছে রাজপুরে তাঁর নিজস্ব 'বিপ্লবী কুটীরে'। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়েই তাঁর দিন কাটত। তাদের পড়াতে তিনি খুব ভাল বাসতেন। শেষ পর্য্যন্ত ঐ ছেলেরাই তাঁর দেখাশুনা করত।

বিপ্লবী ভূপেশচন্দ্র নাগ

ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে ভূপেশচন্দ্র নাগ দেশের বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ঢাকার বারদীর বিখ্যাত নাগ পরিবারের সাবজজের ছেলে ভূপেশচন্দ্র প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হ'লেও, ঘরের সুখ এবং আরাম তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। ঘরছাড়া যে-সব সন্ন্যাসীরা সকল লোকচক্ষুর অগোচরে বিদেশী রাষ্ট্র উচ্ছেদের জন্য আয়োজন ও উপাচার সংগ্রহ করছিল, তিনি তাঁদের সেই দলে ভিড়ে গেলেন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—বাংলায় গোপন ও প্রকাশ্য ব্যায়ামাগার ও স্বদেশী সঙ্গীতের আখড়া বসে গিয়েছিল সেদিন। আর তেমন সব আখড়ার একটির শরীর-চর্চা বিভাগের কর্মসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন ভূপেশচন্দ্র নাগ।

ভূপেশচন্দ্রের যুগে যুব বাংলার সংশয় ও ব্যাকুলতা পশ্চিমী পিউরিটানিজম-এ, ধুয়ে-মুছে একাধারে স্বদেশ ও সেবাব্রতের পথ নিয়েছিল বলা চলে। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষে সেটাই আমৃত্যু

ব্রহ্মাচর্য, শক্তিপূজা, গীতা, সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস, নর-নারায়ণ সেবা এবং মরণ ও মারণ সংকল্প অঙ্কুরিত হয়েছিল। একই সঙ্গে গীতা ও ফুটবল প্রশ্রয় পেয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীঅরবিন্দের লেখা ও সাধনা ভূপেশচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করে গিয়েছেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেও তিনি অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বহরমপুরে অনেক কিংবদন্তিও আছে। বিখ্যাত পুলিন দাসের সহকর্মী ভূপেশচন্দ্র একখণ্ড লাঠির জোরে দশ বারোজন গুণ্ডাকে রুখতে পারতো। তিনটনের রোলার একাই টেনে নিয়ে গিয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করতেন। যে যুগে বি-এ পাশ করলে দূর-দূরান্তের মানুষ তাকে দেখতে আসত, তিনি সেই যুগের একজন গ্র্যাজুয়েটই শুধু নন, বার্মিংহামের শিক্ষাগত ডিগ্রিও তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর নিরলংকার এবং নিরহংকার জীবনে সে-সবের কোন প্রকাশই আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পায়নি। তিনি কিছুকাল ঢাকার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বহরমপুর কমার্স কলেজেও অধ্যাপকের কাজ করেন। সংস্কৃত, ইংরাজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। কিন্তু আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম অত্যন্ত আপনজন হিসাবে। আমাদের ছেলেবেলায় ভূপেশচন্দ্র নাগ আমাদের কাছে ছিলেন পরম বিস্ময়। কারণ আমরা জানতাম যে বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিনবিহারী দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মৈত্র প্রভৃতি যে আটজন দেশপ্রেমিক নেতাকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হয়, ভূপেশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। কিন্তু তাঁর অমায়িক এবং স্নেহপ্রবণ

ব্যবহার কোন সময়েই আমাদেরকে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দূরে থাকার সুযোগ দেয়নি। বিশেষ করে তিনি যখন জানতেন যে, আমরা গোপন বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি। মুর্শিদাবাদ জেলার, বিশেষ করে বহরমপুরের ছেলেদের তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁর অগ্রজ সুরেশচন্দ্র নাগের গৃহে অন্তরীণ বন্দী হয়ে থাকার সময় থেকেই এ জেলার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আমৃত্যু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালের অধিবাসী ভূপেশচন্দ্রকে অনেকেই বহরমপুরের আদিবাসিন্দা বলেই জানতেন। চট্টগ্রামের সূর্যসেন যখন বহরমপুর কলেজে এসে ভর্তি হন, তখন তিনি ভূপেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। বহরমপুরে বসবাসকালে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকলেও, মানুষ তৈরী করার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী অনাদিকান্ত সান্যাল প্রভৃতি অনেকেই তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার ছাব্বিশ বছর পরে আজ যখন ভূপেশচন্দ্র নাগের সম্বন্ধে লিখতে বসেছি, তখন অতীত ইতিহাসের অনেক অনুদ্ঘাটিত তথ্যই মানসপটে ভেসে উঠছে। জীবনকে সুন্দর করবেন বলে, যাঁরা তাঁদের সুন্দর জীবনকে স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গ করেছিলেন, ভূপেশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন।

নতুন যুগের সূচনা।

যদিও ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার মধ্যেই মানুষ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের চক্রান্তের প্রথম প্রমাণ পেয়েছিল এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দিয়েছিল হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, কিন্তু সেই সঙ্গে ১৯০৬ সালে দেশবাসী যে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, সে কথাটাও মনে রাখতে হবে। সেই প্রথম

'স্বদেশী', 'বয়কট', 'জাতীয় শিক্ষা' ও স্বরাজের শ্লোগান সর্বত্র ধ্বনিত হতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে অল্পকালের মধ্যেই স্বদেশী শিল্পেরও পুনরুজ্জীবন ঘটল। কাপড় বোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী মোমবাতি, এনামেলের বাসন, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত আরম্ভ হয়ে গেল। এই সমসাময়িক কালেই কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের কাছে পঞ্চাশ বিঘা জমির উপরে, 'বহরমপুর লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড' নামে একটি চামড়া কারখানা স্থাপিত হয় এবং মহারাজা কাশিমবাজার সেই কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডের সর্বে-সর্বা নিযুক্ত হন। রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন, খানবাহাদুর খোন্দকার মৌলবী ফজলে রব্বি প্রভৃতি মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বোর্ড গঠন করা হলেও, মহারাজাই ছিলেন সেই বোর্ড তথা শিল্পের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার সেই সম্ভাবনাময় শিল্পটি শেষ পর্যন্ত কেন উঠে গেল, সেই বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ এবং 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' আন্দোলনের যুগে কিভাবে দেশভক্ত দানবীর মহারাজাকে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল, সে সম্বন্ধেই দু'টো কথা বলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে অন্যান্য শিল্পের মত স্যার নীলরতন সরকারের উদ্যোগে এবং ফরিদপুরের বিরাজমোহন দাসের সহযোগিতায় ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে 'ন্যাশনাল ট্যানারী' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বদেশী শিল্পোন্নয়নের সেই যুগে, মুর্শিদাবাদে এই শিল্পপ্রচেষ্টা নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পেরাম্বুরে চামড়া ট্যানিং ইন্সটিটিউট থেকে গভর্ণমেন্ট যখন কয়েকটি ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে চর্মশিল্পে উচ্চ শিক্ষালাভ করার জন্য বিলেত

পাঠালেন, তখন সেই ইন্সটিটিউটেই শিক্ষাপ্রাপ্ত মেধাবী বাঙ্গালী ছাত্ররা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। কারণ সরকারের বিচারে রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠস্থান বাংলাদেশের ছেলেরা যদি রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে না পারেন, তাহ'লে তাদের পক্ষে বিলেতে উচ্চ শিক্ষালাভ করতে যাওয়ার অধিকার কি করে থাকতে পারে? মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সেই সময়ে তেমন কয়েকজন মানুষের সংস্পর্শে আসেন বলে শোনা যায়, যাঁরা, মহারাজাকে বাঙ্গালী ছেলেদের এই দুর্ভাগ্যের কথা বুঝিয়ে বলেন। অবশেষে মনীন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টায় যে কয়জন বঙ্গ-সন্তান ইউরোপ এবং আমেরিকায় চর্মশিল্পে উচ্চশিক্ষালাভ করার সুযোগ পেলেন, গোরাবাজারের শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজা তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। হরিনারায়ণ চর্মশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতালাভ করে ১৯০৯ সালে দেশে ফিরে এলেন এবং. এদিকে মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থান থেকেও কিছু প্রতিভাবান যুবক চর্মশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে জেলায় ফিরে এলেন। এই কৃতি এবং মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে সরোজকুমার দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব ছাত্রদের নিয়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সেই স্বদেশী যুগে জেলায় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

সে-সময়ে জেলায় চর্মশিল্প ছাড়াও আরো কয়েকটি শিল্পও প্রসার লাভ করেছিল। বিদেশী পণ্য বর্জন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বয়কটের প্রবৃত্তি পণ্যের ক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাক্ষেত্রে পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করল। শ্রীঅরবিন্দ এবং ডাঃ গুরুদাস ব্যানার্জী, বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগী হন। বিপিনচন্দ্র পাল জাতীয়তার এই নূতন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রূপে আবির্ভূত হলেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায়, স্যার গুরুদাসের পরিচালনায় এইসব জাতীয়তাবোধ দ্রুত প্রসারলাভ করে। অন্যান্য

জেলাগুলির মত মুর্শিদাবাদের মহকুমা শহর এবং গ্রামগুলির মধ্যেও তার প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করতে থাকে। জেলায় সাবান তৈরী এবং তাঁত-শিল্পের কিছু কিছু প্রসার ঘটে। অনেকে চরখায় সুতো কেটে মজুরী দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিতেন। নিজের হাতে-কাটা সুতোয় কাপড় পড়ার বিশেষ একটা গৌরব তখনকার দিনে ছিল। বহরমপুরে ব্রজভূষণ গুপ্তের প্রচেষ্টায় জাতীয় বিদ্যালয় তার কয়েক বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হলেও সে সময়েই তার সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশে একদিকে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন, আর একদিকে 'স্বদেশী' আন্দোলনের চাপে পড়ে অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইংরেজ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করলেন। বাংলার এই সাফল্যে দক্ষিণভারত, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম, মহারাষ্ট্র—এক কথায় বলা চলে সারা ভারতে প্রবল সারা পড়ে গেল। এই সময়েই কোলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজধানী স্থাপন উপলক্ষে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন হাতির পিঠে চেপে চাঁদনীচক্ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কিভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রসার হ'ল, সে যুগের সেই আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলার অবদান কতটুকু ছিল, বিপ্লবী যতীন মুখার্জী, নলিনী বাগচী, নিখিল গুহরায় প্রভৃতি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। এখন দেখা যাক বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের ও বহু আগে ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই-এর গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে ১৯১৯ সালে কংগ্রেস ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া তার আগের কংগ্রেসকে তিন যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল। সেই কালটাকে বলা হয়েছে—সংস্কার বা আবেদন

নিবেদনের যুগ; দ্বিতীয় ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয়েছে—স্বায়ত্ত-শাসনের যুগ এবং তৃতীয় ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত হোমরুলের যুগ। তার পরবর্তী যুগকে স্বরাজলাভের বৈপ্লবিক যুগের সূচনাকাল বলে বলা হয়েছে।

নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন

মুর্শিদাবাদ জেলার রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে সেই প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর ইংরেজ সরকার একটা গোপন সার্কুলার জারী করে; সেই সার্কুলারের মূল কথা ছিল—বিপ্লবীরা ধর্মসভাগুলোতেও গোপন বিপ্লব আন্দোলনের ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্র পুলিশকে ধরে দিতে হবে। সে-সময়ে কোলকাতায় প্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে সেই সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্র সরকার। মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন সেই সম্মেলনে অন্যান্য যাদের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহরমপুরের উকিল বিজয়কৃষ্ণ মৈত্র, দেবেন্দ্র-প্রসাদ বাগচী (উকিল), গোরাবাজারের নফরদাস রায়, নিতাইচরণ সেন ও শশীভূষণ মুখার্জী। বৈকুণ্ঠনাথ সেন তখন জেলার স্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ মৈত্র সেই সম্মেলনে তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সরকার আমাদেরকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস করছে বলেই এই সার্কুলার জারী করা হয়েছে। আমরা আজ সন্দেহভাজন। কিন্তু আমরা এমন কি করেছি যে সরকার এইরূপ ব্যবহার করবেন? দেশের রাজভক্তি আজ ক্রীতদাসের

পর্যায়ে এসেছে। সাদা চামড়ার মানুষগুলো আমাদের কাছে 'সাহেব', নীলকরেরা 'হুজুর' আর 'হাকিম', তবু আমরা রাজভক্ত নই? জাতীয় মহাসভার পত্তন আর নানাস্থানে এসোসিয়েসন—তারজন্যই মনে হ'চ্ছে এই সার্কুলার। কিন্তু জাতীয় মহাসভার আন্দোলন সরকার-বিরোধী তো নয়ই, বরং সরকারের নীতি মেনেই আন্দোলন চলছে।"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময়ে যারা মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়েছিলেন, পুলিশ খোঁজ নিয়েছিল, প্রতিনিধিদের মাদ্রাজ যাওয়ার ব্যয়ভার কে বহন করেছে। যদিও মাদ্রাজ কংগ্রেসে শুধু ঘোষণা করাই হয়েছিল যে, স্বাধীনতা আমাদের আদর্শ। তার অনেক পরে বলা হয়েছে—স্বাধীনতা শুধু আদর্শই নয়, আশু লক্ষ্যও বটে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন একজন প্রতিনিধিকে মফঃস্বলের এক জায়গায় পাঠিয়েছিল। পুলিশ এমনভাবে খোঁজ খবর নিতে লাগল যে, কোন লোকই তাঁকে বাড়ীতে স্থান দিয়ে সরকারের বিষনজরে পড়তে রাজী হয়নি। কথাগুলো উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, যে সময় মডারেট নিবারেলদের

কথা হ'চ্ছে—Still We have the Privalage of living under the best Government in the World" সেই যুগে বৈকুণ্ঠনাথ মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের সভাপতি হয়েছেন, জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছেন, এমন কি ১৯১৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, সেই বছরেই নির্যাতিত নেত্রী এনি বেশান্তের সভানেতৃত্বে কোলকাতায় যে অধিবেশন হয়, সেটাই চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের শেষ সম্মিলিত কংগ্রেস। নরম-পন্থীরা পরে ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন গঠন করে কংগ্রেস থেকে সরে যান।

এক বছরের জন্য জেলাবাসী বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে লেজিস্লেটিভ

কাউন্সিলের সভ্য হিসাবেও দেখেছে। যদিও পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর History of the Congress পুস্তকে অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে তখনকার দিনে কংগ্রেসের 'ওল্‌ড্‌ গার্ড' বলে অভিহিত করেছেন, তবু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে সে-যুগে সর্বপ্রকার প্রগতিমূলক কাজের পুরোভাগে দেখেছেন। কংগ্রেসের ক্রমবিকাশ এবং জনপ্রিয়তা ইংরেজ সরকার যেমন ভাল চোখে দেখছিল না, তেমনি দেশের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল।

দমন-নীতি ও রাউলাট আইন

বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি এ যাবৎ আইনজারী করে বহু ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু দমন-নীতির ব্যাপক প্রয়োগ সত্ত্বেও আন্দোলন আরও জোরালো ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল। বিপ্লব আন্দোলনের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ও তা দমনের জন্য গভর্নমেণ্টের হাতে কি কি ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, সে সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্যে ১৯১৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভারত সরকার লণ্ডন হাইকোর্টের কিংস বেঞ্চে ডিভিসনের জন্য জজ্‌ মিঃ জাস্টিস রাউলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্টই রাউলাট কমিটির রিপোর্ট নামে খ্যাত। ১৮১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল কমিটি তাদের রিপোর্ট দাখিল করে এবং ১৯১৯ সালের ১০ই মার্চ কেন্দ্রীয় আইন সভায় দেশব্যাপী প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সরকারী ভোটাধিক্যে তা আইনে রূপান্তরিত হয়। জনমতের প্রতি সরকারের এই তাচ্ছিল্যের প্রতিবাদে

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, মিঃ এম. এ. জিন্না ও পণ্ডিত বিষ্ণু দত্ত শুক্ল কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য পদে ইস্তফা দেন।

বলা বাহুল্য, রাউলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর, তার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্ব যে জনগণের চিন্তাধারার সঙ্গে আর পা মিলিয়ে চলতে পারছে না, তা এই সময়েই সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক কথায় বলা চলে যে, এই সময় থেকেই কংগ্রেস জাতীয় চরমপন্থী ভাবধারার বাহক হয়ে ওঠে।

গণ-আন্দোলনের পূর্বাভাস

ছ'বছর দণ্ড ভোগের পর ১৯১৪ সালে তিলক মুক্তি পেলেন এবং ১৯১৫ সালে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় এবং লালা লাজপত রায় কংগ্রেসে আবার ফিরে আসায় তিলকের শক্তি বৃদ্ধি পেল।

গান্ধীজী ও জালিয়ানওয়ালাবাগ

রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ গভর্নমেণ্ট নিছক সরকারী সদস্যদের ভোটের জোরে কেন্দ্রীয় আইন সভায় তা পাশ করিয়ে নিলেন।

গান্ধীজী তার কিছু আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেছেন এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। গুজরাটের অন্তর্গত বার্দোলী ও বিহার প্রদেশের চম্পারণের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে

তিনি দেশবাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। গান্ধীজী ১৯১৯ সালের পয়লা মার্চ ঘোষণা করলেন যে রাউলাট বিল বিধিবদ্ধ হলে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। বিল বিধিবদ্ধ হওয়ার পর তিনি প্রথমে ৩০শে মার্চ এবং পরে তারিখ বদলিয়ে ১৬ই এপ্রিল সারা ভারতে সত্যাগ্রহের সূচনা স্বরূপ হরতালের ডাক দিলেন। এদিকে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে এই গণ-আন্দোলন দমনের জন্য কর্তৃপক্ষও বদ্ধপরিকর হলেন। দিল্লী ও অমৃতসরে পুলিশ বেশ কড়া হাতে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দিল। ফলে পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিল। অমৃতসরে জনতা কতগুলি সরকারী অফিসে ও ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গভর্নমেণ্ট পাঞ্জাবের জননেতা ডাঃ সত্যপাল ও কিচলুকে গ্রেপ্তার করেছিল। ১৩ই এপ্রিল নেতাদের মুক্তির দাবীতে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা ডাকা হ'ল। অমৃতসরে শান্তিরক্ষার ভার ছিল জেনারেল ডায়ারের উপরে। ডায়াব সভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বাগে উপস্থিত হলেন এবং কোনরকম হুঁশিয়ারী না দিয়েই গুলি চালাবার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা বেপরোয়া গুলি চালাল। সরকারী হিসাবে তিনশো উনআশি জন এবং বেসরকারী হিসাবে এক হাজার মানুষ এইদিন বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিল। এই অবিস্মরণীয় হত্যাকাণ্ডের অবিসংবাদী নেতা জেনারেল ডায়ার আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সাজোয়া গাড়ীটা গলির মধ্যে ঢুকলো না। আর এক জায়গায় Sedetion Committee-র কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তাঁর বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি অত তাড়াতাড়ি ক্ষান্ত হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন। ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করা হয়। মানুষকে বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই ; শুধু এইটুকু বলা চলে যে, সেই ঘটনার একুশ বছর পরে ১৯৪০ সালে

পাঞ্জাবের বীরসন্তান উধম সিং লণ্ডনে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিলেন। তিনি ডায়ারকে গুলি করে হত্যা করেন।

গত ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজৈল সিং বলেন যে, শহীদ উধম সিং এর দেহাবশেষ লণ্ডন থেকে ভারতে আনা হবে। অবশেষে যথাসময়ে তা আনা হয়েছে।

রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনা গুলো মিলে দ্রুত সংকট ঘনিয়ে এল। ওদিকে যুদ্ধাবসানে মিত্রশক্তি কর্তৃক তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ, ভারতীয় মুসলমানেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন এসে হাত মিলালো।

মুর্শিদাবাদে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলির মত এইসব সর্ব ভারতীয় আন্দোলনের ঢেউ বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদের জনচিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। একদিকে গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মকাণ্ড এবং আর একদিকে প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের আঘাতে মুর্শিদাবাদ জেলা তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বহরমপুর, কান্দী, লালবাগ প্রভৃতি মহকুমাগুলিতে হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। সভাগুলিতে বক্তা হিসাবে সে সময়ে যাদের দেখা যেত তাঁদের মধ্যে ব্রজভূষণ গুপ্ত, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জ্ঞান সরকার, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, গোরাবাজারের কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত, কানফলা গ্রামের জগদীশ চট্টরাজ, অনন্ত সরকার, কান্দী মহকুমার আলি নেওয়াজ, শশাঙ্ক শেখর সান্ন্যাল, নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, হেমাঙ্গপদ বরাট, আব্দুস্ সামাদ, রেজাউল করিম, লাল খাঁ, খাগড়ার ভোলানাথ সাহা,

নশিপুরের বাণীকান্ত চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাইরে থেকে অনেক নাম-করা কংগ্রেস নেতাও সে সময় এসেছিলেন। সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ এবং গণ-আন্দোলনের ভয়াল সুন্দর রূপ মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী হয়তো সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করল। পরে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন মিলিত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মিছিল—"খোদাকা পেয়ার মহম্মদ আলি, সাক্ষাৎ ধরম গান্ধীজী"—প্রভৃতি গান গেয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা করেছে। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদবাসীর জীবনে সে-এক স্মরণীয় দিন বলা চলে।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৯ সালে অমৃতসরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে পাঞ্জাবের আনাচারের নিন্দা করা হয় এবং বৃটিশ প্রস্তাব অসন্তোষ-জনক বলে স্থিরীকৃত হয়। ১৯২০ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে কলকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার প্রস্তাব বিবেচিত হ'ল। গান্ধীজী তাঁর অসহযোগের প্রস্তাব নিয়ে জয়ী হয়ে বেড়িয়ে এলেন। ১৯২০ সালে পয়লা আগস্ট তিলক মারা গেলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হ'তে না পারলেও পরে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীকে সমর্থন করলেন।

স্কুল, কলেজ, আদালত ও আইন সভা এই ত্রয়ী বর্জনের বাণী নিয়ে গান্ধীজী গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেমে এলেন। সারা ভারতে দাবানলের মত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। মাদক দ্রব্য ও বিদেশী জিনিষ বর্জন এবং স্বদেশী প্রচারের মন্ত্রে দেশ মেতে উঠল। গভর্ণমেণ্টও কড়া হাতে আন্দোলন দমন করতে লেগে গেলেন।

মুর্শিদাবাদে আন্দোলনের ঢেউ

গান্ধীজীর ডাক মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্ররা দলে দলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু কে তাদের নেতৃত্ব দেবেন, পথ দেখাবে কে? ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ভিন্ন জেলার এবং পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হওয়ায় তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, তাদের কাজ দেওয়া প্রভৃতি নানা সমস্যা দেখা দিল। অবশেষে ব্রজভূষণ ঘরছাড়া এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সেই সব ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অনেকে আইন ব্যবসা ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জেলার সর্বত্র গাঁজা, মদ এবং তাড়ির দোকান-গুলিও অচল হয়ে গেল।

বর্জন, বর্জন আর বর্জন

দেখতে দেখতে সর্বত্র অসহযোগ আর বর্জন আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করল। স্কুল-কলেজ বর্জন, মাদক-দ্রব্য বর্জন, বিলাতী কাপড় বর্জন, জেলার স্থানে স্থানে বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব হ'তে লাগল। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এলেন তাঁর বিখ্যাত ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ বক্তৃতা নিয়ে। তাঁর সেই সচিত্র বক্তৃতা শুনতে সভাগুলিতে অসম্ভব রকমের ভিড় হ'তে লাগল। মুখে মুখে ফিরতে লাগল তাঁর সেই বক্তৃতার কথাগুলি—"ওরে, ভূষণ বলে কিনবো না আর আমার গলার ফাঁসি।" মেয়েরা, মায়েরা বললেন—"ভেঙ্গে ফেল রেশমী চুড়ি বঙ্গ নারী।" 'চাবুক' সপ্তাহিক পত্রিকার গান এবং কবিতাগুলিও তখন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাও সে সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীকে স্বদেশীব্রত

গ্রহণ করতে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছিল। মদের দোকান, গাঁজার দোকান, তাড়ির দোকান এবং বিলাতী কাপড়ের দোকানগুলির সম্মুখে পিকেটিংরত স্বেচ্ছাসেবকদের লাইন। অনেক সময় বড়রা ছোট ছোট ছেলেদের বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন পিকেটিং করার জন্য। গোরা-বাজারের নিশীথ বসু সর্বাধিকারী, নগেন সেন এবং আরও অনেকে ছেলেদেরকে পিকেটিং করার উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতেন। ক্রেতা বা খরিদ্দারেরা জোর করে দোকানে ঢুকতে গেলে, মাটিতে শুয়ে পড়ে তাদের কেমন করে বাধা দিতে হবে তা শিখিয়ে দিতেন। বিশেষ করে, মদ গাঁজা আর তাড়ির দোকানগুলিতেই কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। অনেক সময় দোকানের সম্মুখে জল ঢেলে, এমন কি বিষ্ঠা ঢেলে পর্যন্ত দিত যাতে কেউ দাঁড়াতে না পারে। বাধার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরী হ'ত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পিকেটিং চলত। নেশাখোরদের অনেক সময় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হ'ত।

বহরমপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বহরমপুরে এলেন। বহরমপুরে তাঁর আগমনের তারিখটি নানাকারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। কারণ সেই বছরেই গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। তখন কামালপাশা তুরস্কে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায়, দেশবন্ধু আনন্দে উৎফুল্ল হন এবং এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি নিয়ে এক এশিয়াটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা বলেন এবং কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর সেই প্রস্তাবে গান্ধীপন্থীরা বেঁকে বসলেন। দৃঢ়চেতা

দেশবন্ধুও পদত্যাগ করে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন। স্বরাজ্য দল পরিবর্তনবাদী ও গান্ধীপন্থীরা পরিবর্তন বিরোধী নামে পরিচিত হলেন। চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের নেতা বলে গণ্য হলেন। বাঙলাদেশে দেশবন্ধুর প্রধান সহযোগী হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। দেশবন্ধু সারা ভারতে এবং বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ঘুরতে লাগলেন। সভা এবং প্রচারের মাধ্যমে স্বরাজ্য দলের কথা প্রচার হ'তে লাগল। বহরমপুরে সভা হয়েছিল গোরাবাজারে,—বর্তমান মোহন সিনেমার সামনে কৃষ্ণনাথ কলেজের ফুটবল খেলার মাঠে। হরিবাবুর বাঁধাঘাটেও তিনি সভা করেছিলেন। সে যুগে মুর্শিদাবাদ জেলায় দেশবন্ধুর অনুগামীদের মধ্যে ব্রজভূষণ গুপ্ত, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জ্ঞান সরকার, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, জগদীশ চট্টরাজ, অনন্ত সরকার, কান্দী মহকুমার আলিনেওয়াজ, হেমাঙ্গপদ বরাট প্রমুখ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

আজকাল দেশের ছোট-বড় নেতারাই শুধু নয়, সাধারণ কর্মীরা পর্য্যন্ত কাজে, অকাজে জীপ এবং এ্যাম্বাসাডার গাড়ী চড়ে ছুটা-ছুটি করে বেড়ান। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, সেদিন দেশবন্ধুকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসার জন্য কোন মোটর গাড়ী তো দূরের কথা, একখানি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী পর্যন্ত কেউ দিতে সাহস করেনি। কারণ দেশবন্ধু স্বদেশী মানুষ, তাঁকে গাড়ী দিলে যদি ইংরেজ সরকারের বিষনজরে পড়তে হয়, সেই ভয়ে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটা তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, আর সেই গাড়ীতে করেই তাঁকে স্টেশন থেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার সময় গাড়ী পাওয়া গেলেও ঘোড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে ছেলেরাই সেই গাড়ী টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার

ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। বহরমপুরে দেশবন্ধুর সভাগুলিতে মানুষ টাকা-পয়সা, সোনা-দানা যার যা সামর্থ্য, দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

নেতার আসনে ব্রজভূষণ গুপ্ত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রজভূষণ গুপ্তকেই জেলার নেতা নির্বাচন করলেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং বলা চলে যে, ১৯২১ সালেই আনুষ্ঠানিক-ভাবে ব্রজভূষণ গুপ্তকে সভাপতি এবং শ্রীকান্ত মুখার্জীকে সম্পাদক নির্বাচিত করে জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়। দেশবন্ধু ব্রজভূষণ গুপ্তকে ওকালতী ছাড়ার জন্য বলেছিলেন কিন্তু, ব্রজভূষণ গুপ্ত তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"আমার দুর্বলতা হেতু মহাপুরুষের সেই উপদেশ মত ওকালতি ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু এক বৎসরেররও কিছু অধিককাল অর্থাৎ সমগ্র ১৯২১ সালে এবং ১৯২২ সালের প্রথম ভাগে অধিকাংশ সময়েই আমি কংগ্রেসের কাজ করিতাম।"

কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজ এবং অসহযোগের বার্তা প্রচারের দায়িত্ব সে সময়ে জেলায় যাদের উপরে ন্যস্ত ছিল, জাতীয়তাবাদী নেতা ব্রজভূষণ গুপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই জেলাবাসী তাঁকে দেশের কাজে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছে। বাংলার সেই প্রজ্বলন্ত বহ্নিশিখার মধ্যে অহিংস অসহযোগের ধার কতটুকু ছিল, তা বলতে পারব/ না; ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে শুধু এইটুকু বলা চলে যে, ১৯০৫-এ গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সভাপতিত্বে বারাণসীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে, বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ তখন জ্বলে

উঠেছে। কিন্তু সেই হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পাশে দেশবাসী গঠনমূলক কর্মসূচীও যে গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, বয়কটের প্রবৃত্তি বিলেতী পণ্যের ক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারলাভ করেছিল। বহরমপুরের অসহযোগীরা ব্রজভূষণ গুপ্তকে বহরমপুরে একটি জাতীয় স্কুল,—এমনকি কলেজ পর্যন্ত স্থাপন করার জন্য বলতে লাগলেন। অবশেষে সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং ব্রজভূষণ গুপ্তের উদ্যোগে বহরমপুরে 'জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়' নামে একটি উচ্চশ্রেণীর জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সেই স্কুলে তাঁদের ছেলেদের লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন। বহরমপুরের মত কান্দী মহকুমার সালারেও মৌলবী রেজাউল করিম, সৈয়দ মকসুদল হোসেন প্রভৃতি কয়েকজনের চেষ্টায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় সে সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। সর্ববিধ গঠনমূলক কাজের পুরোভাগেই তখনকার দিনে জেলাবাসী ব্রজভূষণ গুপ্তকে দেখেছে এবং বলা চলে যে, তাঁকে এবং তাঁর গৃহটিকে কেন্দ্র করেই সে সময়ে জেলার রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, এমন কি মহাত্মা গান্ধীও তাঁর গৃহে পদার্পণ করেছেন। জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত তখন মজবুত না হলেও জনসমর্থন ছিল। একের পর এক নেতা আসছেন, বড় বড় জনসভা হচ্ছে, কিন্তু যে ব্যক্তি এবং যে গৃহটিকে কেন্দ্র করে তা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন ব্রজভূষণ গুপ্ত এবং তাঁর বাসস্থান। সুতরাং বলা চলে যে, সারা জেলার দৃষ্টি তখন ঐ ব্যক্তি এবং গৃহটির প্রতি নিবদ্ধ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সস্ত্রীক তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা ব্রজভূষণ গুপ্তের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। সেটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজকের দিনে সেই ঘটনার তাৎপর্য হয়তো অনুধাবন করা যাবে না। সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে বহরমপুর স্টেশন থেকে আনার জন্য যখন কেউ একটা

মোটরগাড়ী নয়, একটা ঘোড়ার গাড়ী পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল না, পাছে সরকারের বিষনজরে পড়তে হয়, সেখানে বাড়ীতে স্থান দেওয়া অনেকখানি কথা নয় কি ?

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বহরমপুরে আসেন, তখনও এই ঐতিহাসিক গৃহে পদার্পণ করে দেশবন্ধু স্মারক স্থাপনের অর্থ-সংগ্রহের সব দায়-দায়িত্ব তিনি ব্রজভূষণ বাবুর উপরেই অর্পণ করেছিলেন। আবার ১৯২৬ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সরোজিনী নাইডুর বহরমপুরে আগমন এবং ব্রজভূষণবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বই কি ? দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি অগণিত ঐতিহাসিক পুরুষের আগমনে সত্যই সেদিন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা ব্রজভূষণ গুপ্ত এবং তাঁর বাসস্থানের প্রতি সারা বাংলার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে জেলা ছাত্র সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে জেলাবাসী যেমন ব্রজভূষণ বাবুকে দেখেছে, তেমনি দেখেছে প্রবল প্রতিপত্তি এবং টাকাওয়ালা মানুষদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে ও সমাজ-সংস্কারমূলক কার্জে অগ্রণী হ'তে। ১৩৪০ সালে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনিই জেলা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর জেলাবাসী যদিও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (হেমিওপ্যাথ), মৌলবী আব্দুস সামাদ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পেয়েছে, কিন্তু শ্যামাপদ ভট্টাচার্য এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত সব ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করা নেতা খুব বেশী পাওয়া যায়নি।

জননেতা শ্যামাপদ ভট্টাচার্য

১৯২১ সালে জাতীয় আন্দোলনের তূর্যনিনাদ তখন বেজে উঠেছে। ঘরের আরাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তি সব বিসর্জন দিয়ে অনেকেই তখন দেশের কাজে ব্রতী হচ্ছেন। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য তাঁর কয়েক বছর আগেই এম. এ. এবং আইনের সব পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুরে ফিরে এসেছেন। তাঁর সম্মুখে তখন গতানুগতিক বাঁধাপথের রঙ্গীন স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রথমে এল মুনসিফ হওয়ার সুযোগ। তিনি তা গ্রহণ করলেন না, পরে 'রেওয়ার' দেওয়ানের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান হ'ল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজনীতির ফেনিল সমুদ্রে উন্মত্ত তরঙ্গদল তখন তাঁর সম্মুখে গর্জন করছে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যে জাগরণের ঢেউ লেগেছে, সেই তরঙ্গাঘাতে তিনিও তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। বহরমপুর উকিল বারে যোগদান তিনি করলেন বটে, কিন্তু ওকালতি করা শেষ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা আর হয়ে উঠল না। কংগ্রেসের কাজে পুরো-পুরিভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি জাতীয়তা-বাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলা চলে। ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু মিঃ পোলক যখন কোলকাতায় আসেন, সে-সময়ে সিটি কলেজ হলে যে সভা হয়, সেই সভায় পাগড়ীওয়ালা মহাত্মা গান্ধীর পাশে ভিড়ের মধ্যে আমরা শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে যেমন দেখেছি, তেমনি তাঁকে আবার দেখেছি, মহাত্মা গান্ধীর পাশে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর। গান্ধীজী তখন দেশবন্ধু তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য সারা দেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের নির্দেশে সে সময়ে শ্যামাপদবাবু মহাত্মাকে জেলায়

আমন্ত্রণ জানাতে কোলকাতা যান। গান্ধীজী তখন কোলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গৃহেই অবস্থান করছেন। শ্যামাপদবাবু পশুপতি রায়ের সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। গান্ধীজী অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বেটা, কেয়া মাঙ্গতে হো।" তিনি তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলায় যাওয়ার কথা বলাতে মহাত্মা প্রথমে সময়াভাবের কথা বলেন, কিন্তু পরে তাঁর সেক্রেটারী শঙ্করলাল বাঙ্কারের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং শ্যামাপদবাবুকে প্রশ্ন করেন, মুর্শিদাবাদে গেলে তাঁকে কত টাকা দিতে পারবেন? কিন্তু জেলা কংগ্রেসের হাতে তখন মাত্র চার হাজার টাকা মজুদ আছে; সুতরাং তিনি সেটাই দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। কিন্তু গান্ধীজীর তাতে মন ওঠে না, তিনি বললেন—"বেটা, হাম বেনিয়া হ্যায়, উসমে নেহি হোগা।"

যা হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছিলেন এবং জেলার অধিবাসী অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে উনচল্লিশ হাজার টাকা দেশবন্ধু তহবিলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গান্ধীবাদী নেতা হিসাবে শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন সত্য, কিন্তু তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটা দিক হ'চ্ছে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং দলগত সঙ্কীর্ণতামুক্ত মনের উদারতা। বর্তমান সময়ে যখন দলগত এবং আদর্শগত মত-পার্থক্যের জন্য একদলের কর্মী আর একদলের কর্মীর বুকে ছুরি মারতে দ্বিধাবোধ করে না, তখন ভাবতে অবাক লাগে যে, সে যুগের একজন ডাকসাঁইটে বিপ্লবী অমূল্য গাঙ্গুলীর সঙ্গে গান্ধীবাদী শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের বন্ধুত্বের কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। হয়তো অনেকেই জানেন, অমূল্য গাঙ্গুলীই প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলায় যুগান্তর দলের গোপন সংগঠনের বার্তা বহন করে আনেন। গোপন অস্ত্রচালনা শিক্ষা, বোমা তৈরীর উদ্যোগ প্রভৃতি অমূল্যবাবুর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সে সময় যাঁরা কিছু কিঞ্চিৎ জড়িত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। অমূল্য গাঙ্গুলী পরে সায়েন্টিফিক

ইন্স্ট্রুমেন্টের কারবারী হিসাবে অনেকের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে ইংলণ্ড এবং জার্মানীতে তাঁর যাতায়াতও অবাধ হয়েছিল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র নিরঞ্জন সেনকে বোমা-পিস্তলের কারবারী জেনেও তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক করতে শ্যামাপদবাবুর কোথাও বাধাসৃষ্টি হয়নি। কংগ্রেস নেতা হয়েও গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছেলেদের জন্য তাঁর অন্তরে যেমন একটা মমত্ববোধ ছিল, তেমনি গোপনে নানাপ্রকার আর্থিক সাহায্যও তিনি তাদের করতেন। ফলে সর্বপ্রকার মতাদর্শের রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতাদের এক মহামিলনক্ষেত্র ছিল তাঁর আবাসস্থান। সেখানে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র আসছেন, সতীন্দ্রনাথ সেনও আসছেন; আবার প্রতুল গাঙ্গুলীও আসছেন এবং কম্যুনিস্ট নেতা ধরণী গোস্বামী—তিনিও আসছেন। গোপন সভা, তাঁর উপস্থিতিতে, এমন কি অনেক সময়ে তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হতে কোন বাধা ছিল না।

তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অজস্র ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা চলে যে, দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা-অহিংসা, প্রকাশ্য এবং গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের যে দুটি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার মধ্যে বহু দল, বহু চিন্তার সমাবেশ ঘটে থাকলেও লক্ষ্য ছিল এক এবং সে লক্ষ্য 'ইংরেজ তাড়াও'। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যেরও হয়তো সেই কথা ছিল; তুমি টেররিস্ট হও, এনার্কিস্ট হও, গান্ধীবাদী হও, অথবা কম্যুনিস্ট যাই-কিছু হও, পরাধীনতার অবসান কর।

১৯৩০ সালে তিনি প্রথম জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার এবং সন্তোষ রায় সহ কারাবরণ করেন। সেই সমসাময়িক কালে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকার তাঁর ওকালতি লাইসেন্স এক বছরের জন্য বাতিল করে দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা তথা

সারা বাংলাদেশে আইনজীবী মহলে সেই ঘটনা সেদিন কম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেনি। যথাস্থানে সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লেখা হবে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি বৎসরাধিককাল কারাগারে ছিলেন। জেলে থাকা কালেও জনসাধারণ তাঁকে বহরমপুর পৌরসভার কমিশনার পদে বরণ করে নেয় এবং স্থির হয় যে, জেল থেকে মুক্তিলাভ করার পর তাঁকেই পৌরসভার চেয়ারম্যান করা হবে। হয়েওছিল। এই সবই তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসার স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। জেলাবাসীর ভালবাসা এবং প্রীতি তাঁকে একাধিকবার আইনসভায় প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে, বহু প্রতিষ্ঠানের কর্নধার হিসেবও গ্রহণ করেছে।

মুর্শিদাবাদে মহাত্মা গান্ধী

দেশবন্ধু স্মৃতি রক্ষা তহবিলে-অর্থসংগ্রহের জন্য জেলা কংগ্রেসের আমন্ত্রণে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পাঁচুই আগস্ট মহাত্মাগান্ধী মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন যমুনালাল বাজাজ ও সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। পূর্বেই বলেছি যে, অর্থসংগ্রহই ছিল তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং গান্ধীজীকে অতিথি হিসাবে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য যখন অনেকেই দাবি জানাতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই প্রশ্নের মীমাংশা করার জন্য সেদিন যে উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছিল, তা হ'চ্ছে, যিনি বেশি টাকা দেবেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর গৃহেই অবস্থান করবেন। অবশেষে আজিমগঞ্জের নির্মল কুমার নওলক্ষা বাহাদুর দশ হাজার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় স্থির হয় যে, গান্ধীজী তাঁর প্রাসাদেই রাত্রি যাপন করবেন। সেইমত মহাত্মা প্রথমে আজিমগঞ্জে নওলক্ষার প্রাসাদে

যান এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। পরের দিন জিয়াগঞ্জে এড্‌ওয়ার্ড করনেশন ইন্‌স্‌টিটিউসনে (বর্তমানে রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির) এক জনসভা হয়। 'প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল গত হলেও সেদিনের সেই জনসভার একটি ঘটনা মহাকালের কষ্টিপাথরে আজও অম্লান হয়ে আছে। অলেখা সেই ইতিহাস মহাত্মা গান্ধীর জীবনের একটি ঘটনাই শুধু নয়, মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাসেও তা স্মরণীয় একটি অধ্যায় বললে হয়তো ভুল বলা হবেনা।

গান্ধীজী ঘাট পাড় হয়ে জিয়াগঞ্জে সভাস্থলে আসছেন। রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গান্ধীদর্শনের আশায়। সেচ্ছাসেবকরা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিম-সিম খাচ্ছেন। সেই ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ভিক্ষুক প্রাণপন শক্তিতে চেষ্টা করছে মহাত্মার কাছে এগিয়ে আসার জন্য; কিন্তু বার বার তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। গান্ধীজী সেই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করেন এবং সেচ্ছাসেবকেরা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুককে গান্ধীজীব কাছে নিয়ে হাজির করে দিলেন। কিন্তু তার পর যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, কথার মালা গেঁথে আমি তার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করব না।

ভিক্ষুকটির হাতে ছিল একটি চটাওঠা এনামেলের পাত্র। তাতে-ছিল তার ভিক্ষালব্ধ কয়েকমুঠি চাল আর ছিল গোটা তিনেক তামার পয়সা। ভিক্ষুক হয়তো শুনেছিল, গান্ধীজী ভিক্ষা করতেই এসেছেন, সুতরাং জাতভিখারী সেই বৃদ্ধ যখন গান্ধীজীর সামনে হাজির হয়ে তার ভিক্ষাপাত্র থেকে দু'টি পয়সা তুলে গান্ধীজীকে দান করছে এবং গান্ধীজী দু'হাত পেতে সেই দান গ্রহণ করছেন; তখন সে দৃশ্য দেখে অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করতে পারেনি—শুধু তায় নয়, মহাত্মার চক্ষুও হয়তো সেদিন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

জিয়াগঞ্জে সভাশেষে গান্ধীজী কাশীমবাজারে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীব আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেদিন সন্ধ্যায় সভাসমিতির পর

সৈদাবাদে কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের বাড়ীতে এবং পরে ব্রজভূষণ গুপ্তের বাড়ীতে কয়েকঘণ্টা অতিবাহিত করেন, দুপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও ছাত্রদের এক সভায় ছাত্রদের সম্বোধন করে ভাষণদান করেন। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকেরা গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানানোর যে আয়োজন করেন তা আজও উক্ত কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রদের কর্মতৎপরতা ও আন্তরিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁরা গান্ধীজীর হাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১০৭৬ টাকা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিকেলে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের মাঠে এক বিরাট সভা হয়। মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল বর্তমান গান্ধীপার্কে। সেই জনসভায় গান্ধীজী দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানান। মহারাজা প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু গান্ধীজী বলেন—"বম্বেমে তো বহুত দানবীর শেঠ হ্যায়, লেকিন বাংলামে কাশীমবাজার মহারাজাসে কই বড়া হৃদয়বান দানবীর নেহি হ্যায়, এই সা তো মেরা মালুম হ্যায়। পাঁচ হাজার রূপেয়ামে মেরা পেট ভর্তি নেহি হুয়া।" মহারাজা তৎক্ষনাৎ দশ হজার টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। সন্ধ্যায় কলেজস্কুল হলে মহিলাদের একটি সভা হয়। সেই সভাতেও গান্ধীজীর আবেদনে প্রচুর সোনা ও টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার অজস্র মানুষ আর হিংসা-অহিংসা লড়ায়ের স্রোতোধারা দেশের বৃহৎ ধারায় এসে মিশে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবু জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লিষ্ট করে ধরে রেখেছে মহাত্মাগান্ধীর এই জেলায় আগমনের সেই দিনটিকে।

নিরঞ্জন সেনের অবদান

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূচনায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করে যে গোপম বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, ১৯১৯-২০ সাল নাগাদ সেই আান্দোলনের স্রোত যখন স্তিমিত, উত্তাপ যখন নির্বাণোন্মুখ এবং ছাত্ররা একেবারে নিশ্চুপ, তেমন একটা সময়ে ১৯২৩ সালে নিরঞ্জন সেন রিপন কলেজ থেকে আই. এস: সি. পাশ করে দলগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে বহরমপুরে এসে কৃষ্ণনাথ কলেজে বি. এস. সি. ক্লাসে ভর্তি হলেন। ছাত্র নেতা হিসাবে নিরঞ্জন সেন তখন সুপরিচিত এবং 'সর্ব-ভারতীয় ছাত্র কনফারেন্স' সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল নেতা। কিন্তু প্রকাশ্য ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়াও বাংলা দেশের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি তখন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি এসে দেখলেন, কলেজে কোন ছাত্রসংগঠন পর্যন্ত নেই, অথচ ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ প্রচুর রয়েছে। অভিভাবকেরাও নানা ভাবে দুর্ভোগ ভোগ করছেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন কাজ বা সংগঠন না থাকলেও পুলিশের কার্যকলাপ একটুও কমেনি। তিনি প্রথমে কলেজে একটি ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করলেন এবং বলা চলে যে, তাঁর সময়েই কৃষ্ণনাথ কলেজে প্রথম ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করা হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং মুরারি সেন প্রভৃতি বহরমপুরের কয়েকজন বিপ্লবী তরুণকে নিয়ে সেই ইউনিয়নের একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সেদিনকার ম্যানিফেস্টোর গোড়ার কথাই ছিল, ছাত্র-জীবনকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করা। রাজনীতি ছাড়াও সমাজ সেবার বিভিন্ন ধরনের

কাজ গরীব ছাত্রদের পড়ার খানিকটা সাহায্য করা প্রভৃতি। অনাদৃত সাধারণ মানুষ, যাদের রোগশয্যায় দেখার কেউ থাকত না, সেদিন কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদেরকে সেই সব দুস্থ মানুষদের পাশে গিয়ে হাজির হ'তে দেখা যেত। কলেজ হোস্টেলগুলিতে পলাতক বিপ্লবী নেতাদের রাখার আস্তানাও গড়ে উঠেছিল। নিরঞ্জন সেন গোরাবাজারে 'সায়েন্স কটেজে' থাকতেন, সুতরাং গোরাবাজারের অনেক কিশোর এবং যুবক সে সময়ে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তারাপদ গুপ্ত, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ সিংহ, রাধাপদ দুবে, গোপালচন্দ্র দুবে, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র, তারাভূষণ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ বিহারীলাল মেমোরিয়াল ক্লাবকে কেন্দ্র করে যেসব যুবক এবং ছাত্র সে সময়ে একত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সে সময়ে বিপ্লবী নিরঞ্জন সেনের সংস্পর্শে আসেন। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, ক্লাবটি বহুবার পুলিশ তল্লাসী করে এবং এক সময়ে ক্লাবঘর তালাবন্ধ করে দেয়।

বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে তখন অনেক সব নামকরা বিপ্লবী কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও নিরঞ্জন সেনের অন্যতম কাজ ছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তখন বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। সাজা খাটার পর তিনি যখন মুক্তি পেলেন, তখন নিরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে যে দল গঠিত হয়েছিল, তারা কবিকে অভিনন্দন জানাতে জেলগেটে ফুলের মালা নিয়ে হাজির হ'ল এবং গোরাবাজারে যে হোস্টেলে নিরঞ্জন সেন থাকতেন সেই হোস্টেলেই তাঁকে তোলা হ'ল। বিদ্রোহী কবি নজরুলকে ঘিরে সেদিন ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছিল, আজকের দিনে তা অনুভব করা সম্ভব নয়।

ক্রমে নিরঞ্জন সেনের কার্যকলাপ পুলিশের চোখে অসহনীয় হয়ে

উঠল। তারা তাঁকে আর বাইরে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করে একদিন কলেজের মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তাঁর গ্রেপ্তারের সূত্র ধরে বহরমপুর শহরে অনেক যুবক এবং ছাত্রদের বাড়ী বোমা, পিস্তল এবং রিভলভারের সন্ধানে তল্লাসী করা হ'ল। নিরঞ্জন সেন তখন বহরমপুর কাদাই-এর 'নিউ হোস্টেলে' থাকতেন। তাঁর গ্রেপ্তারের খবর ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। কলেজের কোন বাধা-নিষেধ সেদিন তাঁরা মানেননি। সকলেই জড়ো হ'লেন গিয়ে হোস্টেলের সামনে। হোস্টেল তল্লাসী শেষ করে পুলিশ যখন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁর কয়েকজন ছাত্রবন্ধু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ছাত্রদের কাছে তাঁর কিছু বলার আছে কিনা। পুলিশের সামনে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দীর গলায় ফুলের মালা দেওয়া, জয়ধ্বনি দেওয়া এবং গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা সেদিন বড় কম কথা ছিল না। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ভীড় জুটবে সেই আশঙ্কায় পুলিশ তাঁকে গোপনে খাগড়াঘাট রেলস্টেশন দিয়ে প্রথমে মেদিনীপুর সেণ্টাল জেল এবং পরে আরব সাগরের তীরে দুর্গম রত্নগিরি জেল, কর্ণাটকের বেলগ্রাম ও মহারাষ্ট্রের যারবেদা জেলে বেশ কয়েক বছর আটক রেখে অবশেষে ১৯২৮ সালের শেষের দিকে তাঁকে মুক্তি দেয়। মুক্তিলাভ করে আবার তিনি বহরমপুরেই ফিরে এসেছিলেন। সে সময়ে ছাত্র-দলনকারী কুখ্যাত মিঃ স্টেপলটন বহরমপুর পরিদর্শনে এসেছিলেন বহরমপুরের ছাত্ররা নিরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কলেজের ছাত্ররা—"Go back Stapelton" আওয়াজ তুলেছিলেন, আর কলেজিয়েট স্কুলের কৃতিছাত্ররা সেই ঘৃণিত ব্যক্তির হাত থেকে স্কুলের পারিতোষিক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তারা সেদিন স্কুলও বর্জন করেছিলেন।

কিন্তু বিপ্লবীর ললাটে মুক্তিরেখা থাকে না। বিপ্লবী নিরঞ্জন সেনের ললাটেও তা ছিল না। ১৯২৯ সালে তিনি কোলকাতায়

বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। বহরমপুরে তার সূত্র ধরে অনেক জায়গায় তল্লাসী করার নামে পুলিশ লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে এবং কোলকাতায় তারাপদ গুপ্ত এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্রকে গ্রেপ্তার করে।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে যে আলোচনাটা অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে, সেটি হচ্ছে বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত না করলে মুর্শিদাবাদ জেলায় তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। বাংলাদেশে 'অনুশীলন' এবং 'যুগান্তর' নামে যে দুটি বিপ্লবী দল ছিল, তখন সেই দল দুটির মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। নিরঞ্জন সেন মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন অনুশীলন দলের সংগঠক হয়ে, নিরঞ্জন সেনের মত অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী সে সময়ে দল থেকে বেরিয়ে এসে সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচীতে একটি তৃতীয় দল গঠন করার চেষ্টা করেন। দাদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে ঐ সময়টা ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। 'দাদা' মানে দুই দলের তৎকালীন নেতারা, যাঁরা কংগ্রেসে ঢুকে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের পথ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলেন। অথচ নিজের দলের ছেলেদের কাছে বিপ্লবের ভাঁওতা দিতে কসুর করতেন না। তাছাড়া বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মধ্যে যে 'ক্রনিক' একটা আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল এবং যে ঝগড়া বা দলাদলি দলীয় নেতারা কংগ্রেস প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গিয়েও রাজনীতিকে বিষাক্ত করে চলেছিলেন, তার বিরুদ্ধেও এই বিদ্রোহী তরুণ দল অসন্তোষে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে বিপ্লবী কর্মপন্থাকে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত করার নামে 'দাদারা' আসলে তথাকথিত অহিংস ও আইন-সম্মত আইন অমান্য কর্মপন্থার মধ্যেই নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে 'ভ্রাতাদের' আরও একটা অভিযোগ সেদিন বেশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। অথচ এইসব তৎকালীন দলীয় দাদা বা নেতারা মনে প্রাণে গান্ধীজীর অহিংসাকেও গ্রহণ করতে পারেননি, আবার

হিংসার পথও অনুসরণ করতে রাজী ছিলেন না, ফলে তাঁরা সহিংস অথবা কোন অহিংস সংগ্রামের প্রতিই সত্যকার নিষ্ঠা দেখাতে পারেননি। দাদাদের এই না-গ্রহণ, না-বর্জন নীতির ফলে একদিকে বাংলাদেশে যেমন বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে, অপরদিকে তেমনি সত্যিকার গান্ধীনীতির প্রতিও কর্তব্য পালন করা হয় না। তার ফলে দলীয় কূট-কৌশল আর কোন্দল দিয়ে বাংলার যুব সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা হয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দুই দল থেকে ভেঙ্গে আসা ক্ষুব্ধ কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভিত্তিতেই তৃতীয় দল বা 'থার্ড পার্টি'র, প্রচেষ্টায় প্রকাশ পায়। নিরঞ্জন সেন এই নবীন যুব নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বলা চলে। সে সময়ে এই বিদ্রোহকে আমরাই যে শুধু সমর্থন করেছিলাম তাই নয়, সর্বত্র এই বিদ্রোহের পক্ষে সমর্থনও পাওয়া যেতে থাকে এবং একটা বৈপ্লবিক প্রস্তুতির সাজো সাজো রবও সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এক কথায় বলা চলে যে, এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখা দেয়। ভগৎ সিং-এর সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—"In the seeming stillness of Indian humanity a veritable storm is about to break out." কোলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা এই সময়ের কথা। যতীনদাস তখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিংদের সঙ্গে সহবন্দী। তারই কিছুদিন পরে যতীনদাসের ঐতিহাসিক অনশন ও আত্মদান। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাও এই সময়ে আরম্ভ হয়। সুতরাং বলা চলে যে ১৯২৯-৩০ সালে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণ আন্দোলন ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে ওঠে। কোলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হ'ল। প্রবীণেরা জয়লাভ করলেন বটে কিন্তু ইতিহাসের এ-ও এক অ-লিপিবদ্ধ সত্য যে, গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল স্বাধীনতার বাণী এবং সংগ্রামী মহড়া। ঐ যারা

কোলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে নকল মেজর, কর্ণেল, ক্যাপটেন, ভলান্টিয়ার হয়েছিলেন, তাঁরাই শহরে শহরে এবং শহর থেকে দূরে আসল হয়ে উঠতে লাগল। ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের শহর, গ্রাম, গঞ্জও সেদিন প্যারেড্ আর মার্চিং সঙ্-এ মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

দল বা গ্রুপ হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় যারা সে সময় অনুশীলন পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে নিরঞ্জন সেনকে সমর্থন করলেন, তাঁদের সেই গ্রুপটিকে "ফাইটিং স্কোয়াড্" নামে অভিহিত করা হয়। ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, বরিশাল প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় কাজ যখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে এবং ওদিকে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের দল তাঁদের প্রস্তুতি পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমন এক সময়ে ১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নিরঞ্জন সেনকে কোলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা

মেছুয়া বাজার বোমার মামলা আধুনিক চিন্তা জগতে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে বললে হয়তো একেবারে ভুল বলা হবে না। তৎকালীন বাংলা দেশের বিপ্লবী দলগুলির বৃদ্ধ বয়স্ক দাদা বা কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তরুণ কিশোর বিপ্লবীদের সর্বাত্মক বিদ্রোহের লক্ষণ মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় যতখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সম্ভবতঃ তার আগে তেমন ভাবে আর তা ধরা পড়েনি। মেছোবাজারের বোমা যে কেবল ইংরেজকে লক্ষ্য করেই তৈরী হ'চ্ছিল তা নয়, অতিসাবধানী দাদাদের অচলায়তন মগজটাকেও তারা তাগ করছিল।

কোলকাতার কলাবাগান বস্তির ঘটনা, কিন্তু বহরমপুরে এসে তা

আঘাত করল। যারা ধরা পড়লেন তাঁরা প্রধানত ফরিদপুর, বরিশাল এবং বহরমপুরের যুবক। প্রথম দফায় ধরা পড়লেন অপেক্ষাকৃত দু'জন বয়স্ক-সহ একদল যুবক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন সেন, সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী, বিভূতি ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল দাসগুপ্ত, নির্মল দাস, রমেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, আনন্দ কুমার দাস, দেবপ্রিয় চ্যাটার্জী, ধরণীকান্ত বসু, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, সুধাংশু কুমার আইচ।

আরও তল্লাশী, আরও গ্রেপ্তার হয়েছিল, কোলকাতারই জোড়াসাঁকো থানার মদন চ্যাটার্জী লেনের কাছে পাঁচু ধোপানী লেন, পার্বতী চরণ ঘোষ স্ট্রীট এবং শ্যামপুকুর থানার কুমারটুলি, অভয়মিত্র স্ট্রীটের কয়েকটা বাড়ী থেকে ধরা পড়লেন: মহিমারঞ্জন সেনগুপ্ত, সুবোধরঞ্জন চক্রবর্তী, শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত, মহেন্দ্র লাহিড়ী, রবীন্দ্র বসু, সুধাংশু মজুমদার, বিহারীলাল বিশ্বাস, সুধীর রায়চৌধুরী, সুরেশ গাঙ্গুলী, সত্যব্রত সেন, মুকুল সেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত, নৃত্যগোপাল রায় এবং বহরমপুরের তারাপদ গুপ্ত ও পরে নৃপেন্দ্র চন্দ্র মৈত্র। নৃপেন্দ্র চন্দ্র মৈত্রকে গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরেই মুক্তি দেওয়া হয়।

কলাবাগান বস্তির বোমা আবিষ্কার থেকে যে মামলা, তার আর এক নাম মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। কোলকাতায় তারাপদ গুপ্তের গ্রেপ্তারের সূত্রধরে পুলিশ- বহরমপুরে নিরঞ্জন সেনের অনুগামীদের কয়েকজনের বাড়ী তল্লাসী করল এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করল। এই ঘটনার কিছু আগে থেকেই বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদের বৈপ্লবিক রাজনীতির আসর বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। গোয়েন্দা বিভাগের আশুতোষ মুখার্জীর মৃতদেহ গোরাবাজারে জেলখানার সম্মুখে গঙ্গায় ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেল। কর্তব্যরত অবস্থায় আশুবাবুকে হত্যা করা যেমন পুলিশ বিভাগকে সচকিত করে তুলেছিল, তেমনি "বাংলার অরুণদের প্রতি"—ইস্তাহার উইরোপীয়ান ক্লাবের উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্মচারী এবং তাদের অনুগত ভৃত্যদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। তাছাড়া কাশিমবাজার ছোট

রাজবাড়ী—কুমার কমলারঞ্জনের বাড়ী থেকে একটি রিভলভার চুরি যাওয়া এবং না-যাওয়ার ফিস্‌-ফিসানি এবং আরও কতগুলি ঘটনা যখন বহরমপুরে নবাগত ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টর মোহিনী মোহন সান্ন্যাল ও তার প্রসাশনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে ঠিক তেমনি সময়ে মেছুয়া-বাজার বোমার মামলার ঠিক এক বছর পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা সারা বাংলা দেশকে সচকিত করে তোলে।

অস্ত্রাগার দখল ও তার পর

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। রাত দশটা। চাটগাঁর প্রায় একশো যুবক একই সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরের তিন জায়গা আক্রমণ করে। এদের নেতৃত্ব করে ছ'জন ভূতপূর্ব রাজবন্দী। একদল যুবক টেলিগ্রাফ অফিসে হানা দিয়ে এক্সচেঞ্জ কেটে দেয়। একদল একজন সার্জেন্ট মেজর ও একজন রক্ষীকে হত্যা ক'রে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে অস্ত্রাদি লুণ্ঠনের পর অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর এক দল পুলিশ লাইন আক্রমণ করেও তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার পর আক্রমণকারীরা পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাসে এও আর এক লক্ষণ। অসম্পূর্ণ দর্শন। এরা সংকল্প করতে জানে, প্রাণ দিতে জানে, দুঃসাহস ভরে প্রাণ নিতেও জানে, কিন্তু তারপর কি করতে হবে তা জানে না। আজ মনে প্রশ্ন জাগে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মত অতবড় অভাবনীয় সফল ক্রিয়াকাণ্ডের পর ও তাঁদের পালাতে হ'ল কেন? কেন বিপ্লবের মশালটা আগে বাড়িয়ে জনগণের হাতে দিতে পারল না? অতীত বর্তমানের রাজস্ব ভাণ্ডার। তাই অতীতের সমালোচনা আমাদের করতেই হবে। যে অন্ধকার যুগে পরাধীন ভারতীয়রা মান, সম্মান, ইজ্জত, ধর্ম, দেশ—সব কিছুর চেয়ে আপন জীবনের

মূল্যটাকেই সব চেয়ে মূল্যবান বলে মনে করতো; অনেক বক্তব্য অনেক বক্তৃতা যখন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যেত, আর এক পাও এগোতে পারতো না, তখন মৃত্যুভয়টা দূর করাই ছিল অবরুদ্ধ অগ্রগতির চাবিকাঠি। ম্যাট্‌সিনির ভাষায় বলা চলে "Ideas grow quickly when watered by the blood of Martyrs." সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন সেদিন ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীম প্রভৃতি বিপ্লবীরা। নইলে রণকৌশল আর কি? ঠিক কোন জায়গাতে শত্রুর প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে আছে, তার বিচারের মাপকাঠিতে কি ওরা দাঁড়াতে পারে? কিন্তু এক আধটা প্রাণতো নয়, অনেক প্রাণ দিয়ে অর্জন করতে হয়েছিল সেদিন দেশকে, আবিষ্কার করতে হয়েছিল তার মৃত্যুঞ্জয় দেবত্বকে। এইভাবে মৃত্যুবরণটাকে যখন সহজসাধ্য বিষয় করে তুললেন সেদিনের সেই মহাপ্রাণ যুবকেরা, তখন প্রশ্ন দেখা দিল তারপর? প্রশ্ন উঠলো, এই মৃত্যুঞ্জয় চেতনা দিয়েই শত্রুকে পরাস্ত করা যাবে কি?

আক্রমণ, স্বার্থক আক্রমণ, ব্যক্তির ওপর থেকে শত্রুর সংগঠিত শক্তির ওপরে কি করে করা যায়, তারই একটা নিদর্শন মেলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনা থেকে। যাই হোক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে নেমে এল। বাংলায় অর্ডিনান্সের জাল ফেলে বিপ্লবী সন্দেহে হাজারো যুবককে গ্রেপ্তার করল এবং অক্টোপাশের অষ্টবাহু অজ্ঞাত গ্রামাঞ্চল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বহরমপুরেও ব্যাপক তল্লাসী এবং ধর পাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। সেই সূত্রধরে সে সময়ে যে ঐতিহাসিক মামলার সূত্রপাত হয়, এখন সেই ঘটনার কথাই বলব।

একুশে এপ্রিলের সেই দিনটি

১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেঙ্গল আর্ডিনান্স জারী হয়ে গেল এবং পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বাংলাদেশের জেলা, মহকুমা এমন কি গ্রামের সন্দেহ ভাজন বিপ্লবীদের নামের তালিকাও প্রস্তুত করে ফেলল এবং তাঁদের গ্রেপ্তারের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে যখন জাল বিস্তার করল, তখন অনেকেই সেই জালে ধরা পড়ে গেলেন। যারা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করতে পারলেন, তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে থেকে সংগঠনকে গুছিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন।

মুর্শিদাবাদে একুশে এপ্রিলের রাত্রিতে বহরমপুরে অনেকে বাড়ীই পুলিশ ঘেরাও করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গোরাবাজারে কোন বাড়ীতেই 'ওয়ান্টেড' যুবকদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন স্বভাবতই গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা একটু চিন্তিতই হ'ল। তল্লাসী শেষ করে হতাশ হয়ে যখন ফিরে গিয়েছে, তার কিছু পরে কুমার হোষ্টেলের পেছনে একটা বাড়ী থেকে সকলে বেরিয়ে একটা জায়গায় যখন সমবেত হয়েছে, তখন হঠাৎ যমদূতের মত সেখানে দু'জন দেহরক্ষীসহ সাইকেলে ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টর মোহিনী মোহন সান্ন্যাল স্ব-শরীরে হাজির হ'লেন। তাকে দেখা মাত্র যে যেদিকে পারল মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্রকে অনুসরণ করে এবং তার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে রান্নাঘরে তার মায়ের কাছে থেকে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। স্বভাবতই সে কারণে একটা হল্লা হয় এবং নৃপেন মৈত্রের দাদা উপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ইন্‌স্পেক্টরের কাজে

বাধা দেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। তাতে ইন্সপেক্টর মোহিনী সান্ন্যাল সামান্য পরিমানে আহাত হন। ইন্সপেক্টরের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে পাশের বাড়ী থেকে রামচন্দ্র দুবে এবং মনীন্দ্রচন্দ্র দুবে ছুটে আসেন এবং আরও বহু মানুষের ভীড় জমে যায়। ইত্যবসরে মোহিনীবাবুর দেহরক্ষী ছুটে গিয়ে পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে যে রিপোর্ট দেয়, তাতে অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে ওঠে। উপেনবাবু, মনীবাবু, রামবাবু ইন্সপেকটর সান্ন্যালকেহত্যা করেছে। এই সংবাদে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত এক বাহিনী নিয়ে পুলিশ সাহেব উপেনবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হন এবং সেখানে পৌঁছে দুই ভাই নৃপেন্দ্র মৈত্র এবং উপেন মৈত্রকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। উপেনবাবুকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু নৃপেন মৈত্রকে শেষ পর্য্যন্ত অর্ডিনান্স বলে আটক করা হয়।

উপরিউক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টর তাকে হত্যার এলং রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ দিয়ে উপেনবাবু, রামবাবু মণিবাবুর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলা শেষ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে বিশেষ এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কারণ দুবে ভ্রাতৃদ্বয় বহরমপুর উকিলবারের লব্ধ প্রতিষ্ট উকিল হওয়ায় বারের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য উকিল বারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাকে বলা হয় যে এই মামলায় কোন উকিল উকিলের বিরুদ্ধে ব্রিফ্ গ্রহণ করতে পারবেন না। ফলে মামলায় সরকার পক্ষে কোন উকিল পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে হেতু উকিল বারের সভাপতি হিসাবে শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য সেই প্রস্তাব উত্থাপন করে ছিলেন এবং শশাঙ্ক শেখর সান্ন্যাল তা সমর্থন করেছিলেন, সেইহেতু সরকার সাময়িকভাবে তাঁদের ওকালতির লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা কোর্টে ওকালতি করতে না পারেন।

উপেনবাবুকে সেই মামলায় শেষ পর্য্যন্ত একমাস জেল ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি আপিলে মুক্তিলাভ লাভ করেন। সেই মামলায় যখন বহরমপুর উকিলবারের লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবি কালিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক শেখর সান্যাল প্রমথ ভাদুরী, প্রবোধচন্দ্র মৈত্র, শরৎচন্দ্র ব্যানার্জি, দ্বীজপদ সেনগুপ্ত প্রভৃতি উকিলেরা রামবাবু, মনীবাবু এবং উপেনবাবুর পক্ষ সমর্থন ক'রে দাঁড়িয়েছেন, তখন দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতেই হ'চ্ছে যে, বহরমপুরেই উকিল নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য উকিলবারের সেই সর্বজন সমর্থিত প্রস্তাব সেদিন অগ্রাহ্য কোরে মোহিনী সান্যালের পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে তাঁকে উকিলবারের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

বিদেশী সরকার শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ও শশাঙ্ক শেখর সান্যালের ওকালতি লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং নগেনবাবুকে রায় সাহেব খেতাবে ভূষিত করেছিলেন, কিন্তু শ্যামাপদবাবু এবং শশাঙ্কবাবুকে জনসাধারণ প্রীতির মাল্যে ভূষিত করেছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে, রায় সাহেব নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের ভূমিকাই কি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একক এবং অনন্য হয়ে আছে? বাংলাদেশে জীবনদানী বিপ্লবীর জন্ম কিছু কম হয়নি। নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে এবং অকুতোভয়ে তাঁরা যে দেশ প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র ও খুব বেশী নেই, কিন্তু হতভাগ্য এই দেশে মীরজাফরের একটা লাইন ও কম প্রবল ছিলনা। ভারতবর্ষে বোমারু বিপ্লবী বলতে যেমন ছিল বাঙ্গালী, তাঁদের ধরবার জন্য, তাঁদের ফাঁসীকাঠ পর্য্যন্ত পৌছে দেবার দুষ্ক কৃতিত্বও বাঙ্গালী গোয়েন্দাদের। বাংলাদেশে এই বিপরীত মিশ্রণই হয়তো বাংলাকে বড় হ'তে দেয়নি বাংলা কখনও কোন ক্ষেত্রে এক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, না হিংসায়, না অহিংসায়।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালির শ্মশানে আমরা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন গান্ধীজী প্রশ্ন তুলেছিলেন—বাংলাদেশের বিপ্লবীরা কোথা উবে গেল ?

তীর্থ হ'ল বন্দীশালা

১৯২৮ সালের শেষের দিকে নিরঞ্জন সেন যেমন জেল থেকে মুক্তিলাভ করে বহরমপুরেই ফিরে এলেন, তেমনি বাংলা দেশের বহু বিপ্লবী বাংলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য বহু জেল ও দ্বীপান্তর থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন।

ঐতিহাসিক কোলকাতা কংগ্রেসে তাঁরা অনেকেই একত্র হওয়ার সুযোগ পেলেন। 'অনুশীলন' 'যুগান্তর', 'শ্রীসঙ্ঘ', 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' প্রভৃতি বহু দল এবং উপদলগুলি বিভক্ত হলেও সকলের মধ্যেই যেন একটা কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার এসে গেল। প্রতি জেলায়, মহকুমায় এমন কি গ্রামেও গোপন বিপ্লব আন্দোলনের শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করল। গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ, অস্ত্র শিক্ষা ও কুচ-কাওয়াজের মহড়া চলতে লাগল সর্বত্র।

সে সময়ে এই সাংগঠনিক কাজে প্রচুর সাহায্য করেছিল, সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' ও মাসিক 'বেণু' পত্রিকা। অতি গোপনে এবং পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছিল 'বালেশ্বর দিবস', 'শহীদ নলিনী বাগচী দিবস।' প্রকাশ্যে সেদিন তা পালন করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর কংগ্রেস যেমন একটা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল, বাংলা দেশের বিপ্লবী দলগুলি তেমনি নিজ নিজ ক্ষেত্রে বৃটিশ রাজশক্তিকে একটা চরম আঘাত হানার জন্য পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত ছিল। ১৯২৯-শে মেছুয়াবাজার বোমার মামলা এবং ১৯৩০-শে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, সেই পরিকল্পনারই প্রকাশ বলা চলে।

একদিকে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আর একদিকে অস্ত্রাগার দখল। আরব সাগর তীরে লবণ সত্যাগ্রহ লক্ষ্যে মার্চের ডাণ্ডি অভিযান, আর বঙ্গোপসাগর তীরে অস্ত্রাগার দখল-লক্ষ্যে এপ্রিলের বিপ্লবী অভিযান। দু'টোই একই লক্ষ্যে প্রধাবিত।

সরকার তরি-ঘরি অর্ডিনান্স জারী করে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের বন্দী করলেন। কিন্তু বিপ্লব চিরমুক্ত, তাকে বন্দী করা যায় না। বহু যুবককে গ্রেপ্তার করার পরেও যখন কোলকাতা এবং আশে-পাশে অনেকগুলি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ঘটে গেল, তখন সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সমাজ ও বিক্ষুব্ধ। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলে তখন অসহযোগী রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবী রাজবন্দীদের এক জেলেই রাখা হ'ত। সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিপ্লবী ছোঁয়াচ থেকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

১৯৩০-এ, পুজোর সময় খোলা হ'ল বক্সাক্যাম্প। নেতৃস্থানীয় কিছু রাজবন্দীকে বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে সেখানে সরিয়ে রাখা হ'ল। হিমালয়ের লোকালয় বর্জিত সুদূর অঞ্চলে এদের নির্বাসন দিলে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা ব্যাহত হবে বলে মনে করেছিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু তা হ'ল না।

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে খোলা হ'ল হিজলী বন্দী নিবাস। পরে রাজপুতানা মরুভূমি অঞ্চলে দেউলিতে ও একটা বন্দী নিবাস খোলা হয়। বেশীরভাগ তরুণ রাজবন্দীদের পাঠানো হ'ল হিজলী বন্দী নিবাসে।

বন্দী শিবিরগুলিতে রাজবন্দীরা পুর্ণোদ্যমে পালন করতে লাগলেন স্বাধীনতা দিবস (২৬শে জানুয়ারী) এবং প্রতিটি শহীদ দিবস।

এই সব কারণে জেল কর্তৃপক্ষ এবং বন্দীদের মধ্যে ঠোকা-ঠুকি লেগেই থাকতো। তাছাড়া খারাপ খাদ্য প্রভৃতি কারণে বন্দীরাও যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছিলন, তেমনি বালেশ্বর দিবস, যতীনদাস দিবস, গার্লিক হত্যা প্রভৃতিকে উপলক্ষ করে ক্যাম্পের মধ্যেই তাঁরা উৎসব

পালন করতে থাকায় কর্তৃপক্ষও বন্দীদের সমুচিৎ শিক্ষা দেওয়ার কথা হয়তো চিন্তা করছিলেন।

অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ বন্দীদের শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। ১৬ই সেপ্‌টেম্বর সেই স্মরণীয় দিন। রাত্রি ন'টার সময় যখন সকলে খেতে বসেছে, তখনই হঠাৎ পাগ্‌লাঘন্টি বেজে উঠল এবং হৈ হৈ করে বন্দুকধারী সেপাইরা ক্যাম্পের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল! তারা নির্বিচারে গুলি চালাল। সে গুলিবৃষ্টিতে অসুস্থ তারকেশ্বর সেন আর সন্তোষ মিত্র মারা গেলেন। হাতে গুলি লাগল কৃষ্ণনগরের গোবিন্দপদ দত্তর, শশীন্দ্র ঘোষের পায়ে গুলি লাগল। সেপাইরা ঘরে ঘরে ঢুকে যাকে পেল তাকেই পিটতে লাগল। বহরমপুরের সবিতা শেখর রায়চৌধুরী মাথা ফেটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল, তারাপদ গুপ্তের গলায় গুলি লেগেও আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেলেন। বহরমপুরের আরও অনেকে সেই গুলি বৃষ্টি এবং বেয়নেট চার্জে আহত হয়েছিলেন। খড়গপুর রেল-হাসপাতাল আহত বন্দীতে ভরে গেল। খবর চাপা থাকলো না, বাইরে চলে গেল। সারা দেশ ক্রুদ্ধ এবং চঞ্চল হয়ে উঠলো। অস্থির হয়ে উঠলেন দেশনেতারা। দু'রাত, একদিন শবদেহ নিয়ে বন্দীরা বসে কাটালেন। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষ চন্দ্র বসু গেলেন। বন্দীরা তাঁদের প্রিয় সাথীদের মৃতদেহ ফুলে ফুলে সাজিয়ে 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি দিয়ে নেতাদের হাতে তুলে দিলেন। বন্দীশালা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল।

রাজসাহীতে অড়িনান্সের ঘূর্ণিঝড়

১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের সংলগ্ন বে-অফ বেঙ্গলের গর্ভ থেকে যখন ঝড় উঠেছে তখন ২১-এ এপ্রিল রাজসাহীতে চলছিল রাজনৈতিক অধিবেশন। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুল গাঙ্গুলী, বঙ্কিম মুখার্জী,

ত্রৈলক্য চক্রবর্তী যথাক্রমে মনোনীত হয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ইয়ং কম্‌রেডস্‌ লীগ ও ওয়ার্কার্স কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট। রাজসাহীর ঐ সম্মেলনের চত্বরে সেই ঝড় নিদারুণ এক অর্ডিনান্সের ঘূর্ণি সৃষ্টি করল। সব প্রেসিডেন্ট সমূলে নিক্ষিপ্ত হলেন কারা-প্রাচীরের ভেতরে, বিনা বিচারে বন্দী। ঐ ঘূর্ণিপাকে পড়েছিলেন আরও অনেকে ওখানে এবং সারা বাংলা জুড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও অনেকে ধরা পড়লেন। অহিংস কংগ্রেস আর সহিংস-মন্ত্রশিষ্যেরা যেন একাকার হয়ে গেলেন। বাংলা দেশের এ এক বিশেষ রূপ এবং সারা ভারতে হয়তো তার তুলনা নাই।

তবু ১৯৩০-এ চট্টলা বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন একক অদ্বিতীয় ঘটনা নয়, বাংলা দেশে এ যেমন দিয়েছিল বহু বাধার অবরোধে বন্দী তারুণ্যকে পূর্ণ মুক্তি, সারা ভারতে ও তেমনি। ১৯৩০-এর অহিংস আইন অমান্যকে উপলক্ষ্য করে ঘটেছিল রুদ্ধকণ্ঠ গণশক্তির অসামান্য অভিব্যক্তি। ১৯৩০-এ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ, স্বাধীনতা দিবস পালন, আইন অমান্য আন্দোলন, কাউন্সিল বর্জন, এমন কি ছাত্রদেরও কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান, ভারতীয় বণিক সমাজের প্রত্যক্ষ সহযোগ ও সমর্থন জনসাধারণের মনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের এমন একটা প্রত্যাশা জাগ্রত করেছিল যে, তারা-সর্বস্বত্যাগ, সর্বস্বপণ করে ১৯৩০-এর আন্দোলনের চূড়ায় উৎক্ষেপ করেছিল। কোন দুঃখকেই দুঃখ মনে করেনি। উদ্যত লাঠির নীচে মাথা, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির মুখে বুক এগিয়ে দিয়েছে, কারাবরণ করেছে, মৃত্যুকে ভয় পায়নি।

বহরমপুরে যুব-ছাত্র সম্মেলন

এই সমসাময়িক কালেই মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একটি গ্র্যান্টহলে

লতিকা বসুর পৌরোহিত্যে ছাত্র সম্মেলন এবং ঐ গ্র্যাণ্টহলেই অপরাজেয় কথাশিল্পী এবং "পথের দাবী" গ্রন্থের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আরও একটি জনসভা হয়। সেই সভায় প্রধান অতিথি হয়েছিলেন বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলী।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লবীরা জাতীয় কংগ্রেসকে সব সময় তাঁদের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু সময় সময় কিছু অসুবিধাও দেখা দিত, সেই জন্য তাঁরা একটি নুতন প্রকাশ্য সংগঠন গড়ে তোলেন, যার নাম দেওয়া হয় যুব সমিতি। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তার শাখা স্থাপিত হয়। বহরমপুরে সেই সম্মেলনেরই প্রথম অধিবেশন হয়। নিশিথ বসু সর্বাধিকারী সেই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, অথবা বলা চলে বিপ্লবী যুব শক্তির মুখপাত্র নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেদিন সেই যুব সম্মেলনের যে কি তাৎপর্য ছিল এবং পুলিশের চোখে যে তা কতটা বিপদজনক ছিল, আজকের দিনে তা বোঝান যাবে না।

প্রাদেশিক সম্মেলনের চত্তরে

১৯৩১ সাল। বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের চত্তরে এসে পড়েছি আমরা। না, বহরমপুর নয়, সিরাজনগরী। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা বিদেশীর চক্রান্তে এই মুর্শিদাবাদের মাটিতেই নিহত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। রাধার ঘাটের কাছে বিরাট এক চত্তরের তাই নামকরণ করা হয়েছিল 'সীরাজনগরী'; ওরই পাশে মস্ত এক এলেকাজুড়ে হয়েছিল বিরাট এক প্রদর্শনী, নাম দেওয়া হয়েছিল, 'বৈকুণ্ঠ প্রদর্শনী।'

মনে থাকে যেন শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ, সন্তোষ মিত্র এবং

তারকেশ্বর সেনের শব ডিঙ্গিয়ে আমরা সীরাজ নগরীতে এসে পৌঁচাচ্ছি। ফাঁসী মঞ্চে ওঠার সময় দীনেশ ধ্বনি দিয়েছিলেন, “বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক”। হয়নি। বিপ্লবকে দীর্ঘজীবন দিতে পারেন নি ঐ সব বিপ্লবীরা। কিন্তু সেদিন তো ছিল সূর্যের মত জ্বলন্ত বিশ্বাস তরুণদের হৃদয়ে হৃদয়ে। ভগৎ সিংও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—“বিপ্লবের বেদীমূলে আমাদের যৌবনকে এনেনি আমরা প্রজ্জ্বলিত ধূপের মতো, কেন না ঐ মহৎ লক্ষ্যে কোন আত্মাহুতিই বড় নয়। আমরা সেই বিপ্লবের অপেক্ষা করছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।”

ইতিহাসের নির্মম খড়গাঘাতে এই সব বিপ্লবীদের অনেককেই আমরা পথপ্রান্তে ফেলে রেখে এসেছি। মানুষের দাঁড়াবার সময় নেই। হয়তো ইতিহাসেরও তাই।

তবু বলি, ১৯৩১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বহরমপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের চত্বরে এসে হাজির হ'লাম আমরা। রাজসাহীর ভাঙ্গা হাটের পর বহরমপুর সম্মেলন ছিল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালনার নির্মম আঘাত তখনও সারা বাংলাদেশ সামলে উঠতে পারেনি। দু'দিনের প্রাদেশিক সম্মেলনে মূল প্রস্তাবটাই তাই ছিল হিজলীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডকে নিন্দা করে। সম্মেলনের সভাপতি হরদয়াল নাগ স্বয়ং সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সেই সম্মেলন আজও আমাদের সকলের মনে অম্লান হয়ে আছে। আজও চোখের সামনে ভাসছে, বহরমপুর কোর্ট স্টেশন থেকে 'সিরাজনগরী পর্যন্ত পথপরিক্রমার সেই ছবি। মুর্শিদাবাদ জেলার যুবশক্তিকে কুচকাওয়াজ করে যেতে দেখেছি সেদিন। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল কার্য্যতঃ সেই বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলেন বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনা করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রদর্শনী সংগঠনের কাজে দুর্গাপদ সিংহ,

সনৎ রাহা প্রভৃতি কয়েকজনের বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। হ্যাঁ, সেই প্রথম দেখলাম জেলার তরুণীরা লাল পাড় হলুদ রং-এর খদ্দরের শাড়ী পড়ে দাঁড়িয়ে পতাকা অভিবাদন করছেন। কে. এফ. ন্যারিম্যান সেই পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। সোনালী বর্ণের উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে সিরাজনগরীর আনাচে-কানাচে, আর তেমনি এক গম্ভীর পরিস্থিতি, এরই মধ্যে বিউগল, বন্দেমাতরম, লং লিভ রিভলিউসন ধ্বনির মধ্যে ন্যারিম্যান পাতাকা তুলেছিলেন, সে স্মৃতি আজও মনের মধ্যে অম্লান হয়েরয়েছে স্বেচ্ছাসৈনিকের সারিতে দাঁড়িয়ে সেদিন মনে হয়েছিল, দেশ সংগ্রামে প্রস্তুত—বলিদানে অকুণ্ঠিত মায়েরা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলবি অব্দুস সামাদের সেই ভাষণের পর মুর্শিদাবাদ জেলা যে কোনদিন সাম্প্রদায়িকতার পাঠ গ্রহণ করতে পারে তা কে ভেবেছিল? অথচ ১৯৩৭ সালে এই বহরমপুরের কুমার হোস্টেলে সারাভারত মুসলিমলিগ সম্মেলন সম্ভব হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনের পর থেকে ধীরে ধীরে জেলার মুসলমান সম্প্রদায় মহম্মদআলি জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বে মেতে উঠেছিলেন—সে কথা তো অস্বীকার করার উপায় নাই।

বহরমপুরে সারাভারত মুসলিম সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, আজ তা স্মরণ হচ্ছে না, তবে বেশ মনে পড়ছে, বন্দেমাতারমের বিরুদ্ধে অনেকেই বক্তৃতা করেছিলেন। ওটা যে কাফেরদের একটা মন্ত্র সেটা সর্ববাদি সম্মত হয়েছিল।

স্মরণ থাকে যেন, পরে ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে 'বন্দেমাতরমের' অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র সেদিন নেতাজী হননি, কিন্তু তবু গোটা সম্মেলনের আকর্ষণটাই যেন তিনিই ছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তুলসী গোস্বামী, দেশবন্ধুর ভগিনী ঊর্মিলা দেবী, লাল মিঞা, নরেন চক্রবর্তী, সামসুদ্দিন আমেদ, এম. এস. এ্যানে, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত এবং আরও অনেকে সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। বঙ্কিমবাবু রাজসাহী থেকে ছাড়া পেয়ে এসে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং তিনিই বিনাখেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব এনেছিলেন। যতদূর স্মরণ হ'চ্ছে, অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে শ্রীঅজিত দত্ত সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশ হ'তে পারেনি।

জেনারেল সেক্রেটারী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জয়েণ্ট সেক্রেটারী জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ বাঁসরী সেন এবং ভলান্টিয়ারদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিজয়কুমার ঘোষ। এঁদের সকলের অমানুষিক পরিশ্রম এবং সহযোগিতায় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

সম্মেলনের শেষে সেই মণ্ডপেই ছাত্র সম্মেলন হয়েছিল। সভাপতি হয়েছিলেন লাস মিঞা। সুভাষচন্দ্র, হ্যারিম্যান, হরদয়াল নাগ এবং আরও অনেকেই সেই সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ছাত্র কন্‌ফারেন্স অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং অনন্ত ভট্টাচার্য ও দুর্গা সরকার ছিলেন জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

কান্দী কনফারেন্স

বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনের পর কান্দীতে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কান্দী রাজবাড়ীর দেওয়ানখানায় সেই সম্মেলন এবং বর্ণাঢ্য মিছিল আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। সকালের নবোদিত সূর্যালোকে আলোকিত হয়ে উঠেছে সমগ্র সম্মেলন প্রাঙ্গণটা। মাঝখানে সুউচ্চ পতাকা-দণ্ডে জাতীয় নিশান পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে কয়েক হাজার মানুষের সেই ভিড়। তিউধারনের ঠাঁই নাই। বহু হৃদয়কে মথিত ও প্রতিধ্বনিত করে উত্থিত হ'ল বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি। উঃ চারিদিকে কি হর্ষধ্বনি।

কালের কোলে ১৯৩১-৩২ ব'লে কোন দাগ, সীমা বা রেখা আছে কি? জানি নে। কিন্তু কান্দী সম্মেলনের সেই দাগ চিহ্ন মনের মধ্যে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। সীমাবদ্ধ কালের অনেক ঘটনাই যেমন কালাতীত, কান্দী সম্মেলনও হয়তো তাই।

বিপ্লবী সতীন্দ্রনাথ সেন সেই সম্মেলনের সভাপতি। অবনীকুমার দত্ত সম্মেলনের সেক্রেটারী আর সেদিনের নামকরা স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বামনদাস মুখার্জী ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটিই ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন। কিন্তু এই সম্মেলনের অনেক আগে থেকেই মহকুমাব ঘরে ঘরে স্বদেশী মন্ত্র এবং রামেন্দ্র সুন্দরের বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পৌঁছে গিয়েছিল। স্বরাজ রথের আগমনীধ্বনি সেই চরখার ঘর ঘর শব্দে অনুরণিত হচ্ছিল। জিতেন রায়ের পরিচালনায় একটি খাদি প্রতিষ্ঠানও সে সময়ে কান্দীতে খোলা হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্য কংগ্রেসী আন্দোলনের সমান্তরাল রেখায় সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের আয়োজনও যে দেশ জুড়ে চলছিল, কান্দীকনফারেন্স শেষে সেই আয়োজনের তাগিদেই তরুণদের দাবি মেনে নিতে হয়েছিল। সম্মেলন শেষে কিছু টাকা যা উদ্বৃত্ত হয়েছিল, সেই টাকায় জেমুয়া, বাঘডাঙ্গা, ছাতিনা, কান্দী প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে ব্যায়ামের আখড়া খোলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই ব্যায়ামের আখড়াগুলিই ছিল সে সময়ে গোপন বিপ্লব আন্দোলনের শক্তিকেন্দ্র বিশেষ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহরমপুর এবং কান্দীতে কংগ্রেসের এই দুটি সম্মেলনে জেলার এবং জেলার বাইরের বিপ্লবীরা কিছুটা সু-সংগঠিত হওয়ারও সুযোগ পায়। জেলার প্রখ্যাত বিপ্লবী অমূল্য গাঙ্গুলী কান্দী সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সে কাজে নানাভাবে সহায়তাও করেন। সতীন্দ্রনাথ সেনও সম্মেলন-শেষে বহরমপুরে এসে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের গৃহে যেমন কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে একটি প্রকাশ্য সভা করেন, তেমনি হিরালাল দাসগুপ্ত,

শ্রীমন্ত দাসগুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবী কর্মীদের সূত্র ধরে একটি গোপন বৈঠকও করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বরিশাল দারোগা পিটান মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হিরালাল, শ্রীমন্ত, নিতাই প্রভৃতি যুবকেরা বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল থেকে কান্দী কনফারেনসের কয়েকমাস আগে মুক্তিলাভ করেন এবং আমাদের আশ্রয়ে কয়েকদিন থেকে একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিলেন। পরে জানা যায় সতীন্দ্রনাথ জিয়াগঞ্জেও একটি গোপন সভা করেছিলেন।

১৯২৮-এ কোলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে কর্মীরা জেলায় জেলায় ফিরে যাওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে একটা ভাঙ্গা-গড়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল বলা চলে। কারণ ১৯২৮-এর কংগ্রেসমণ্ডপে স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতি বাংলার বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে ভাঙ্গা-গড়ার যে ইতিহাস, সে ইতিহাস এখানে অনুক্তই থাক, আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে সেই ভাঙ্গা-গড়ার পেছনে যা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেটা হ'চ্ছে বাঙলার যুব-মনের অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্য।

কোলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন হেরে গেলাম। ঘড়ির কাঁটা একটা বছর পিছিয়ে গেল। আমরা মানিনি সেকথা; আর মানিনি বলেই তো কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় পাড়ায় পাড়ায় কুচ্-কাওয়াজ আরম্ভ হয়ে গেল।

বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন এবং কান্দীতে জেলা সম্মেলনে হয়তো শাসকশ্রেণী যুবমনের সেই অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল।

মুর্শিদাবাদেও গ্রেপ্তারের ঘূর্ণিঝড়

৩১-এ এপ্রিল রাজসাহীতে রাজনৈতিক অধিবেশনে যেমন অর্ডিনান্সের ঘূর্ণিঝড় উঠেছিল, ঐ ১৯৩১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর বহরমপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের আগে এবং পরে তেমনি সারা মুর্শিদাবাদ জুড়ে গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সুভাষ চন্দ্র বহরমপুর থেকে মালদার পথে ১৯৩১-এর ১৮ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার হলেন। আর তারই আগে এবং পরে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করে হিজলি, বক্সা ও দেউলির ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠান হ'তে থাকল।

১৯২৯-এ মেছুয়াবাজার বোমার মামলার সূত্র ধরে বহরমপুরে গ্রেপ্তারের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁরা ঐ মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তাঁদেরকে আবার বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করা হয়, সে কথাও যথাস্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার পর থেকে জেলাতে গ্রেপ্তার, তল্লাসী, বহিষ্কার, অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। প্রতিদিন সকালে দেখা যেত পুলিশ শহরের কোন-না-কোন বাড়ী ঘেরাও করে আছে এবং তল্লাসী শেষে সেই বাড়ীর কোন একজন ছেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে। প্রথম দফায় বহরমপুর থেকে যারা ধরা পড়লেন, তাঁদের মধ্যে রাধাপদ দুবে, গোপাল চন্দ্র দুবে, তারাভূষণ রায়, যতীন্দ্রনাথ সিংহ, সবিতাশেখর রায়চৌধুরী. বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, মাতৃ-পিতৃহীন তারাভূষণকে গ্রেপ্তার করতে এসে পুলিশ তাঁকে বাড়ীতে না পেয়ে তাঁর সাত বছর আর ন'বছরের দুটি বোনকে শীতের রাত্রিতে গঙ্গার ধারে খালিগায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে। পরে তারাভূষণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তারপর আরও তল্লাসী, আরও গ্রেপ্তার। মিহির মুখার্জী, অমর সরকার, অমূল্য মজুমদার, সুকুমার রায়চৌধুরী, অনিল দাস, কেশব চ্যাটার্জী, অনন্ত ভট্টাচার্য, তারাপ্রসন্ন বসু সর্বাধিকারী, ননীগোপাল বাগ্‌চি, প্রবোধ সরকার, ত্রিদিব চৌধুরী, হিরেন সরকার, হরেন সরকার, নলিনী ব্যানার্জী, অরবিন্দ বসু, প্রহ্লাদ বসু, রাজেন সরকার, সত্য ঘোষাল, সুনীল ঘোষ, শৈলেন মুখার্জী, অসিত চ্যাটার্জী, কিছু পরে, কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র কৃষ্ণলাল—যাহাকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অপরাধে সাজা দেওয়া হয়। ওদিকে জিয়াগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার হলেন জগদানন্দ বাজপেয়ী, মতিলাল পাঁড়ে, লালচাঁদ পাঁড়ে, গৌরীপ্রসাদ সেন, শৈলেন অধিকারী দুর্গাপদ সিংহ, হেমদাকান্ত চক্রবর্তী, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, ননী ঘোষ, শৈলেন্দ্র নাথ দাস, শরবিন্দু মজুমদার এবং আরও অনেকে। লালবাগ থেকে পুলিশ সুধীর ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করল আর কান্দী থেকে গ্রেপ্তার করা হ'ল প্রভাত সিংহ এবং সুশীল ঘোষকে। এছাড়া বি. সি. এল. এ. আরও যাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল কিন্তু এক-দেড় মাস পরেই মুক্তি দেওয়া হ'ল, তাঁদের মধ্যে ছত্রপতি রায়, নিশিথ নাথ বসু সর্বাধিকারী, হৃষিকেশ মল্লিক, শৈলেশ চ্যাটার্জী, খগেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং কুলটি থেকে মঙ্গলময় মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলময় মৈত্রকে পরে জামালপুর থেকে বহিষ্কার আদেশ দেওয়া হয়। অস্ত্র আইনে এবং ডাকাতির মামলায় সে সময়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে যারা জেলে গেলেন, তাঁদের মধ্যে দেবী ভাদুড়ি এবং প্রফুল্ল কুমার গুপ্তের নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সকলের নাম তো আজ আর স্মরণে আনতে পাচ্চিনা; কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় স্রোতধারা এসে মিশেছিল দেশের মুক্তি সংগ্রামের সেই বিরাট স্রোতধারায়, সে হিসাব কে রেখেছে? ক'জন জানে যে মুর্শিদাবাদেরই জেলে ১৭ বছরের ছেলে মাণিকলাল সেন অখাদ্য খাবার দেবার প্রতিবাদে অনশনে প্রাণ দিয়েছিলেন? তাঁর পুত ভস্ম গিয়েছিল বারাণসীতে গঙ্গাজলে বিসর্জনের জন্য। এমনি

যারা কতশত অখ্যাত-অজ্ঞাত মহাপ্রাণ যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে?

সাইমন কমিশন এলো গেলো

এই সব রাজনৈতিক আন্দোলনের ফাঁক-ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে সাইমন কমিশন এলো এবং চলে গেলো। কোলকাতায় এসেছিল ১২ই জানুয়ারী। মাদ্রাজে গেল ১৮ই ফেব্রুয়ারী, পেল বিরূপ অভ্যর্থনা। ১৪ই মার্চ নাগপুরে—সেখানেও সেই 'সাইমন ফিরে যাও', আর কালো পতাকা। ২৬শে এপ্রিল যখন লণ্ডনে ফিরে গেল, তখনও দেড়শ' ভারতীয় বিক্ষোভ জানাল। সেই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ১৯২৯-এর ২৩-এ ডিসেম্বর যেদিন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বের হ'ল, সেদিন বড়লাটের স্পেশাল ট্রেনটি বোমায় উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। 'সাইমন গো ব্যাক', আন্দোলন মুর্শিদাবাদেও অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। অমন সর্বাত্মক হরতাল জেলায় খুব কমই হয়েছে বলা চলে।

বহরমপুর এ্যাসোসিয়েসনের কথা

এই সমসাময়িক কালে বহরমপুরে যে বহরমপুর এ্যাসোসিয়েসন গঠিত হয়, সেই সংগঠন সে সময়ে নানা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে থাকায় তা সরকারের কোপানলে পড়ে। সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে পরমেশ রায়চৌধুরী, মধু বোস, জ্যোতিষ বেদজ্ঞ, রাজেন সরকার এবং আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। সনৎ রাহাকে গ্রেপ্তার করে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিরুপমা দেবী, কবি সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল প্রভৃতি অনেকেই এক সময়ে এই সংগঠনে যোগদান করেছিলেন। সনৎ রাহা সেই সংগঠনের কয়েক বছর সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, তিনি ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে ১৯৩২ সালে সংগঠনকে সরকার বে-আইনী বলে ঘোষণা করে এবং সংগঠনের অফিসঘর তালাবন্ধ করে দিয়ে যায়। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনও বে-আইনী ঘোষিত হয়। সেই বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য যাঁরা জেলা থেকে কলকাতায় যান, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীতেন্দ্রনাথ রায়, কেদারনাথ মুখার্জী, শচীন বাগচী, অন্নদা হালদার, সাকেৎ ব্রহ্ম, প্রভৃতি অনেকেই পুলিশের লাঠি চার্জে আহত হন।

দুই ধারা এক লক্ষ্য

বাংলা দেশের রাজনীতিতে দু'টো ধারা চিরদিনই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটি সবরমতী হয়ে ডাণ্ডি, ডাণ্ডি থেকে কুমিল্লা, কুমিল্লা থেকে কাঁথি এবং মহিষবাথান গিয়ে মিশেছে। আর একটি সেই ১৯০৮ থেকে গোপন পরিক্রমায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম উপকূলে এসে উত্তাল হয়ে উঠেছে। সরকারী ইতিহাসলেখক যাঁরা তাঁরা, বাংলার এই শেষোক্ত ধারাকে প্রায় অস্বীকারই করেছেন। তাঁদের কাছে শেষ পর্য্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকই হয়তো সত্য হয়েছে। কিন্তু কোনটা যে শাসক শ্রেণীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, সে প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে আমার প্রবৃত্তি নেই।

১২ই মার্চের সকাল সাড়ে ছ'টা গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহী

নিয়ে শুরু করলেন পদযাত্রা। লক্ষ্য—আরবসাগর তীরে ডাণ্ডি। যাত্রাপথের দু'ধারে জনতার সারি, কণ্ঠে কণ্ঠে "গান্ধীজী কি জয়।"

"Either I return with what I want or my deadbody will float in the ocean."

'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'। তামাম হিন্দুস্থান উথলে উঠেছিল সেদিন। একই সঙ্গে গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-কাবেরী, আরবসাগর-বঙ্গোপসাগরে উদ্‌ভ্রান্ত ঝড় দেখা দিয়াছিল।

৫-ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে গান্ধীজীর যাত্রা সমাপ্ত হয়েছিল। ৬-ই এপ্রিল তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে লবণ-আইন ভঙ্গ করেছিলেন। এদিকে কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট পশ্চিমবাংলার কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য সদলে যাত্রা করলেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। পথ পরিক্রমার ইতিহাসে লেখা আছে, ওঁরা কোলকাতা হয়ে বাঁকুড়া পৌঁচেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলাও সেদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলনা। দুর্গাপদ সিংহের নেতৃত্বে যেমন একটি দল মহিষবাথানের দিকে যাত্রা করেছিল, তেমনি অভিজাত ঘরের সন্তান সালারের মকসুদল হোসেনের (জুমাই মিঞা) নেতৃত্বে সালার থেকে আর একটি দল কাঁথি অভিমুখে যাত্রা করেছিল এবং আরও একটি দল নলিনী ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বহরমপুর থেকে যাত্রা করেছিল বলে জানা যায়।

বহরমপুরে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে সময়ে আরও যারা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সনৎ রাহা, ষোড়শীকুমার রাহা, তুষার রায়চৌধুরী, ধনেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমসাময়িক কালে মোহিত (শম্ভু) ভট্টাচার্য শশাঙ্কশেখর সান্ন্যালের মাতার সঙ্গে ১৪৪ ধারা অমান্য করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। মিছিলে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল এবং সকলে জেলগেট পর্যন্ত গিয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার চারিটি মহকুমাতেই সেদিন সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। দলে দলে, হাজারে, হাজারে মানুষ এগিয়ে এসেছে "Victory or death" এই ছিল মোটো, "জয় নয় ক্ষয়" এই ছিল শ্লোগান। লালগোলার বিনয় মিত্র, বৈদ্যনাথ পাণ্ডে, রমানাথ রায়, শিবেন্দ্রনারায়ণ রায়, জীবেন্দ্রনারায়ণ রায়, শশাঙ্ক চ্যাটার্জী, হরিপদ রায় এবং আরও অনেকে আইন অমান্য করে কারাবরণ করলেন। হাসানপুর থেকে নরেন বিশ্বাস এবং আরও অনেকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তাঁদের সকলের বিস্তারিত নামের তালিকা সংগ্রহ করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব হ'চ্ছে না সেজন্য দুঃখিত।

দুই ধারা, এক লক্ষ্য। প্রকাশ্য কংগ্রেসী আন্দোলনের সমান্তরাল রেখায় সশস্ত্র বিপ্লবের যে ষড়যন্ত্র সারা বাংলা দেশ জুড়ে চলেছিল, মুর্শিদাবাদেও সেই দ্বিমুখী ধারার প্রকাশ আমরা সূচনাকাল থেকেই দেখেছি। পরবর্তীকালেও এই জেলার যাদেরকে গান্ধী আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে দেখেছি তাঁদেরই অনেককে দেখেছি বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে। হিংসা-অহিংসার একটা অস্পষ্ট সীমারেখার বন্ধন সেদিন চোখে পড়েনি। ১৯২১-এ গান্ধী এথিক্সে বিশ্বাসী ছিলেন যাঁরা, চারিদিককার বলিদানের আবহাওয়ায় বাংলা আর পাঞ্জাবের মূর্তি দেখে তাঁরা মাঝে মাঝে হয়তো কেউ কেউ আঁৎকে উঠতেন, কিন্তু অন্তরের অভ্যন্তরে ওদের দেশপ্রেমকে যে অস্বীকার করতে পারতেন না, তেমন পরিচয় আমি অনেক পেয়েছি। জেলে এবং জেলের বাইরে তেমন নামকরা গান্ধীবাদী নেতার দেখা আমি পেয়েছি, যাঁরা নতুন পাওয়া বিশ্বাসে নিজেদের চরখাটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছেন, কিন্তু নির্ভয় আত্মোৎসর্গকে ছোট করতে পারেননি।

জঙ্গীপুর এবং কান্দীতে

মহাত্মাগান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন জেলার সদর বহরমপুরকে উদ্বেল করে তুলেছে, তখন জঙ্গীপুর এবং কান্দী মহকুমা-শহর এবং গ্রামগুলিও পিছিয়ে ছিল না। ১৯২১ সালে বিজয় ঘোষাল ও দুর্গাশংকর শুকুলের উদ্যোগে মাত্র ১৪ জন সভ্যকে নিয়ে বাড়ালা গ্রামে প্রথম যে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেখানে বহুখ্যাত এবং অখ্যাতনামা দেশসেবক এসে যোগদান করেছিলেন। যাঁরা জঙ্গীপুর মহকুমায় সে সময়ে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, কারাবরণ করেছিলেন এবং নানাভাবে কংগ্রেসের কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের অবিনাশচন্দ্র মৈত্র, স্যাণ্ডার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চনতলার বলেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপতিভূষণ দাস, হিলোড়ার দিবাকর ঘোষহাজারা, সাগরদিঘীর মধুসূদন মাজিত, ছোট কালিয়ার বিষ্ণু সরস্বতী, বালিঘাটার গোপাল দাস, বাড়ালার বিনয় গোপাল ঘোষ, জরুরের রোহিণী কুমার রায়, প্রদ্যোৎ সাধু, ডাঃ ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণী ঘোষ, সাকেত ব্রহ্ম, ব্যোমভোলা সেন, প্রভাস সেনগুপ্ত, সর্বময় দেব সরকার, শম্ভুচরণ রায়, বসন্ত সরদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জামুয়ার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করেন। ফলে বোর্ড শূন্য হলো। সরকার নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু কোন ভোটারই নির্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি। নির্বাচন পণ্ড হয়েছিল। সরকার সে সময়ে বিজয় ঘোষালের সিদ্ধিকালীর বাড়ী দখল করে নিয়ে পুলিশ মোতায়েন করেছিল। লালা লাজপৎ লাইব্রেরীর সব বই ও দেশবন্ধু খাদি ভাণ্ডারের সমস্ত কাপড় ও আসবাবপত্র পুলিশ দখল করেছিল।

জঙ্গীপুরের মত কান্দী মহকুমাতে ও সে সময়ে গ্রামে গ্রামে অজস্র মানুষ গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে কারাবরণ এবং নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। আগেই বলেছি সালারের মকসুদল হোসেন ওরফে জুমাই মিঞার নেতৃত্বে একটি দল সে সময়ে পদব্রজে কাঁথি সমুদ্র উপকূলে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে এবং অন্যান্য কারণে সে সময়ে ঐ মহকুমার যারা গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন, তাঁদের সকলের কথাও আজ স্মরণে আসছে না, তবু যাদের কথা মনে পড়ছে, তাঁদের মধ্যে বাংলা দেশের অন্যতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক মালিহাটি গ্রামের সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতি দত্ত, অশ্বিনী অধিকারী, কাঁদরার উকিল আলিনেওয়াজ খাঁ, আবদুল রেজাক; সুধাংশু রায়চৌধুরী, কান্দীর প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা পতিতপাবন মিশ্র, ডাঃ মধুসূদন ঘোষ, হেরম্ব কুমার দাস, সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়, অমিয় দাস, মদনমোহন সিংহ, সত্যহরি মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডল গ্রামের কিরিটি ভূষণ দাস, আন্দুলিয়া গ্রামের মদন উপাধ্যায়, গোকর্ণ গ্রামের জগবন্ধু দাস, রাধাশ্যাম চক্রবর্তী, ভক্তিভূষণ ধর, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোসবাসপুরের আবদুল রহমান ফেরদৌসি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কান্দী মহকুমার জনসাধারণ যাঁদেরকে এক সময়ে তাদের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন, যাঁরা বার বার জেল-জরিমানা, অন্তরীণ, বহিষ্কার প্রভৃতি নানাপ্রকার নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু কোন শাস্তি অথবা নির্য্যাতনের কাছে মাথা নত করেননি, গান্ধীবাদী নেতা হিসাবেই যাঁরা মহকুমায় সমধিক পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ অবনী কুমার দত্ত, চিনমোহন সিংহ, পতিতপাবন মিশ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিনমোহনবাবু বিপিন পালের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু অবনীবাবু, চিনমোহনবাবু, পতিতপাবনবাবুদের মত বিশিষ্ট নেতা এবং

কর্মীদের সেদিন ইতিহাসের তরঙ্গশীর্ষে দেখা গেলেও বিনয় চৌধুরী (খোঁড়া) এবং বিশ্বনাথ চৌধুরীর মত অসংখ্য অগণিত মানুষও তো আছেন, যাদের নাম বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। যারা বোনেদের ইঁটের মত অন্ধকারে, জলে, কাদায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে বুক পেতে দিয়েছেন, যার উপরে গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার ইমারত।

মহাকাল যখন তার দুর্জয় আহ্বান প্রেরণ করে পুরাতন পৃথিবীটাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন একটা জগৎ সৃষ্টি করার জন্য, অভূতপূর্ব পেরণায় অসংখ্য মানুষের বুকে তখন রক্তধারা দুলে উঠে। কোথা থেকে অগণিত অখ্যাতনামা বীরের দল তখন ছুটে পথে বেড়িয়ে আসে তার কি কোন হিসাব থাকে? গাঁজা-মদের দোকানের মালিক বিশ্বনাথ চৌধুরী এবং বিনয় কুনার চৌধুরী তেমন একজাতের মানুষ। তাঁদের গরু-বাছুর নিলামে ওঠে, ব্যবসাপাট লাটে ওঠে কিন্তু অন্তরের ডাকে তাঁরা সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েন। কান্দী মহকুমার আরও একজনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের তালিকায় যার কোন নাম পর্য্যন্ত নাই। সেই অমিয় দাস (ব্যাঙ) বিভিন্ন নামে বার বার বিভিন্ন জায়গা থেকে কারাবরণ করেছিলেন।

কিন্তু জেলে না গিয়েও যাঁরা আন্দোলনে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, ত্যাগস্বীকার করেছিলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করেছিলেন, জাতীয় শিক্ষা প্রসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রেজাউল করিম, রমণী মোহন দে, আবদুল গনি, গোলাম হোসেন, গোলাম মহবুব, কান্দীর কবিরাজ কানাই পদ সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যারা সেবাকাজে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সে সময়ে কান্দীর তরুণ উকিল অরুণ ভট্টাচার্য, হরে হরে সিং চৌধুরীর নাম করা যেতে পারে। একসময়ে কান্দী বিশেষ

করে সালারের কংগ্রেস কর্মীদের কাজ কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। যার জন্য বহরমপুর থেকে ব্রজভূষণ গুপ্ত প্রায়ই সেখানে যেতেন। কোলকাতা থেকে সুভাষ চন্দ্র হেমন্ত সরকারকেও পঠিয়েছিলেন কান্দী এবং সালারের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

গান্ধী আন্দোলনের পটভূমিতে সবশেষে শক্তিপুরের সুধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বার বার মনে পড়ছে। দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মানুষটি টি. বি. রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কর্মে বিরতি দেন নি।

কান্দীতে এইসব অহিংস গান্ধী আন্দোলনের পাশে হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কার্যকলাপের একটা ধারা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রকাশ্য কংগ্রেসী আন্দোলনের সমান্তরাল রেখায় সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের যে ষড়যন্ত্র সারা বাংলাদেশ জুড়ে সে সময়ে চলছিল মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সেই দ্বিমুখী ধারার প্রকাশ আমরা সূচনাকাল থেকেই দেখেছি। এমন কি পরবর্তিকালে যাদেরকে গান্ধী আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে দেখেছি, তাঁদের অনেককেই আবার দেখেছি বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে। হিংসা ও অহিংসার একটা অস্পষ্ট সীমারেখার বন্ধন সেদিন যেন চোখে পড়েনি।

বিপ্লবী নিখিল গুহরায়ের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে কান্দী বোমার মামলার কথা বলা হয়েছে। এস. ডি. ও.'র বাড়ীতে বোমা ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মামলার উদ্ভব হয়, সেটাই কান্দী বোমার মামলা নামে খ্যাত। সেই মামলায় কান্দী মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক যুবককেই গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একজন এপ্রুভার খাড়া করে নিখিল গুহরায়কে লম্বা মেয়াদে, মধুসূদন সেনগুপ্তকে পাঁচ বছর এবং শিবুদাকে দু'বছর সাজা দেওয়া হয়। প্রায় বছর খানেক সাজা খাটার পর আপিলে শিবু মুক্তিলাভ করে এবং

নিখিলবাবুকে আন্দামানে পাঠান হয়। মধুসূদন সেনগুপ্ত সাজা খেটে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তিলাভ করার পর তাঁর এক বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। পরে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করাও হয়।

১৯৩৩-৩৪ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে নেতা করে যে বিখ্যাত বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয়, তাতেও কান্দী মহকুমার ভরতপুর থানার মালিহাটি গ্রামের প্রদ্যোৎকুমার রায়চৌধুরী ও জগৎ দাসগুপ্তকে পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং সোনারুন্দি গ্রামের প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সকলকেই আন্দামান পাঠান হয়।

বৈপ্লবিক শক্তির নিরুদ্ধ সমাধি

ইতিহাস বলছে ১৯৩৪ সালের ৮ই মে দার্জিলিং-এ লেবং ঘোড়-দৌড় মাঠে বাংলার সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের শেষ সহিংস গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, লক্ষ্যটি ছিল তৎকালীন বহু অত্যাচারের হোতা বাংলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন। এ সমাজে ঘোড়-দৌড় বিত্ত শালীদের একটা বৈধ জুয়াখেলার বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা। কেন না, এ সমাজ বিত্তশালীদের। সুতরাং, সেখানে লাট সাহেবের উপস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল না, রোমাঞ্চকর ছিল বিপ্লবীদের উপস্থিতি। সমাজের বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য এখানে যেন আরও পরিস্ফুট। বৃহত্তর সমাজ নির্বীর্য হয়ে আছে, বিত্তশালীরা যক্ষের মত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে চলেছে; নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে ভাবের বন্যা যুবশক্তিকে ভাসিয়ে আনছে ফাঁসী মঞ্চে, কারাগারে, নির্বাসনে। আমলা-প্রহরী-গোয়েন্দা নিম্নমধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিনিয়ত অসম্ভব করে রাখছে; শাসকেরা আলাল-দুলালের কল্যাণে ঘোড়-দৌড়ে

বাজি ধরছেন। বাংলার ভূস্বর্গ দার্জিলিংয়ের লেবং মাঠ তাদেরই সমাবেশ স্থান।

দু'জন বাঙালী যুবক এত তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিজাল ভেদ করেও লাট সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াল। ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের পরণে সাহেবী পোশাক।

খোদ লাট সাহেবের পাশে; তারই ঘোর-দৌড়। স্যার জন এণ্ডারশুন বক্সে বসে আছেন। ভবানী ও রবীন্দ্র দুই পাশে কাছ ঘেষে দাঁড়াল। গুলি। দুই দিক থেকেই। কিন্তু ব্যর্থ লক্ষ্য। আততায়ীরা ধরা পড়ে। ক্রমশঃ আরও অনেকে গ্রেপ্তার হয়।

সমাজ প্রতিক্রিয়ায় মুখর হয়ে উঠল। যে সমাজ নির্বিবাদে আপন স্থিতি ও আত্মজের নিশ্চিত অবস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে সে সমাজে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হ'ল। কোলকাতা মহানগরীর বিরাট পৌর প্রতিষ্ঠানে নিন্দা সূচক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। অনেকেই অনেক কথা বললেন। শ্রীসন্তোষকুমার বসু বললেন: একটি প্রকাশ্য স্থানে গুপ্তঘাতকগণ একজন গবর্নরের প্রাণনাশের প্রয়াস পাইয়াছিল, এতদপেক্ষা নিদারুণ বিষয় আর কি হইতে পারে? শ্রী সি. সি. বিশ্বাস বললেন: বস্তুত ঐ বুলেটটি বাংলা দেশের সুনাম ও মর্যাদাকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার স্বরাজ্য দলের নেতাগণকে ঐ বৈপ্লবিক অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার জন্য অনুরোধ জানান। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নিন্দাবাদীরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাইলে বাধা দেবে কে? কিন্তু বাংলায় বিপ্লবীদের এই বিশিষ্ট ধারা নিন্দাবাদে স্তিমিত হয়নি, অথবা নিন্দাবাদ চৌত্রিশ সালের মধ্যভাগে এসেও সুরু হয়নি। বিপ্লববাদ আর নিন্দাবাদ তো সমান্তরাল রেখাতেই চলে আসছে। কিন্তু তবু বলতেই হবে যে, বাংলায় বিপ্লবাদের এই বিশিষ্ট ধারা আপন গতিতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে চৌত্রিশের মধ্যভাগে, দ্বন্দ্ব প্রগতির নিয়মে এই বিশিষ্ট ধারার অসামঞ্জস্যের রূপায়ন এতদিনে

বহুদূর অগ্রসর হয়েছে নিতান্ত মোহান্ধের চোখেই তা ধরা পড়েনি। '৪২ সালের ভারতের ভেতরে সহিংস ও অহিংস অভ্যুত্থান অথবা ৪৭ সালের খণ্ড ভারতের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত যেতে হ'লে এই ভাবদ্বন্দ্বের অধ্যয় এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই বলেই তা উল্লেখ করা অপরিহার্য, কেন না ভারতের জনগণের দৃষ্টি আগে—আরও আগে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাংলা তথা ভারতের অভ্যন্তরে যে ভাবসংঘাতের সূচনা হয়েছিল, রোমাঞ্চকর ঘটনাস্রোতে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে তখনও তা ধরা পড়েনি। ইতিহাস বলছে, জেলখানায়, বন্দীশিবিরগুলিতে পরবর্তিকালে নিঃসহায় নিরুপায় নিষ্কর্মা পরিস্থিতিতে বন্দীদের মনে তা নূতন এক নেশার সৃষ্টি করতে লাগল। তাদের মধ্যে আবার যারা মেয়াদী কয়েদী হয়েছিল, আর যারা বন্দীশিবিরে আটক হয়েছিল, তাদের অভিমানও উগ্রতায় যে তারতম্য আরও পরে পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের ঘটনায় প্রকাশ পেলেও মূল ও স্থূল ভাবৈক্যই আলোচ্যকালের একটা ঘটনা বলা চলে। বাংলাদেশের জেলে অথবা আন্দামানে দেখা গিয়েছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের রোমাঞ্চকর আওতায় যারা মোহমুগ্ধ ছিলেন, কালের পরিমাপে তাদের আরও তাড়া-তাড়ি মোহমুক্তি ঘটেছিল। দেখা গিয়েছে ১৯৩৪ সালেও যাদেরকে আত্মপ্রসাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব ছিল, মাত্র এক বছর পর ১৯৩৫ সালে তাদের মধ্যে নতুন পথের ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য প্রবল ও অদম্য অনুসন্ধিৎসা দেখা দিল।

রাজশক্তি এইখানে হয়তো একটু চালে ভুল করেছিল। "ভাল ছেলে হব আমি পাঠে দেব মন", বিপ্লবীদের ভাবগতি হয়তো এই

সঙ্কল্পে পাল্টাবে, এই মনে করে অতিবুদ্ধি 'গোয়েন্দা বিভাগের পরামর্শে সরকার কারাভ্যন্তরে সাম্যবাদী সাহিত্য আমদানির পথ প্রথম দিকে উন্মুক্তপ্রায় রেখেছিল। বৈপ্লবিক গণ্ডিতে ঘটনাক্রমে আগত কয়েক হাজার ছেলের মধ্যে সকলেই বিপ্লবের ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন না; এক দল সুবেধে ছেলে সত্যি-ই পাওয়া গেল, যারা অনুমতি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রাচীরগুলো উত্তীর্ণ হওয়ার আয়োজনে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তার মধ্যে একদল যুবক সাম্যবাদী সাহিত্য গোগ্রাসে গিলতে সুরু করে দিলেন। রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে তা নিয়ে তাদের সঙ্ঘাত নিতান্ত নগণ্য হয়নি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনা স্থগিত রেখে বলা যেতে পারে, ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত সেখানে 'বিদেশী' সাম্যবেদী সাহিত্যের প্রতি অধিকাংশের একটা বিরাগ নয়, বিদ্বেষ ছিল ১৯৩৫ সালে পরিবর্তন এলো জোয়ারের মত। প্রাচীন, স্থবির ভাবহীনতার উর্বরক্ষেত্রে তখন ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন, মার্ক্স, এঙ্গেলস, প্লেকানভ, লেনিন, ট্রটস্কি, স্ট্যালিন, বুখারিন, ল্যাপিডাস, এমন কি কাউট্স্কি, ক্রপটকিন। আনুসঙ্গিক মূল সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ক্ষুধার্ত বিপ্লবীদের মুখে এসে পড়তে লাগল। বন্দীশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'ল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিদ্যুৎ আলোকে

.৯৩৭ সালের শেষে এবং ১৯৩৮ সালের মাঝা-মাঝি পর্য্যন্ত বিনা বিচারে আটক শিবিরের বিপ্লবীরা একে একে মুক্তিলাভ করলেন। অনেকের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ায় জেলখানা এমন কি আন্দামান থেকেও দেশে ফিরে এল। কিন্তু বাইরের সমাজ তাদের খুব সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল এমন কথা বলা চলে না।

ভাত-কাপড় সংগ্রহে তাদের অনেককেই আপাততঃ বিপ্লবের মন্ত্র ভুলতে হ'ল এবং কেউ কেউ এমনই আত্মহারা হয়ে গেল যে, পরবর্ত্তী কালে তাদের আর কোন আন্দোলনে দেখা গেল না। কিন্তু যারা বাইরের ঝড়-ঝাপটায় বেঁচে রইলেন, অন্যান্য জেলার মত মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তাদের দেখা গেল কেউ কংগ্রেস, কেউ কম্যুনিস্ট, কেউ ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী সাম্যবাদী প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। মুক্তিপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের একটা বড় অংশই তখনকম্যুনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকেছিল বলা চলে। কারণ বোধ হয় অহিংস কংগ্রেসের বাইরে কর্মসূচী তাদের যাইহোক, শ্রেষ্ঠতম বৈপ্লবিক সাহিত্যের সঙ্গে তখন সংযোগ ছিল একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিরই। সুতরাং বৈপ্লবিক দলের সহিংস রোমাঞ্চ অনুভব করার বাহন ছিল ঐ একটি দলই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না-আসা পর্য্যন্ত এর অভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য অনুদ্‌ঘাটিতই ছিল; কিন্তু সে আলোচনা স্থগিত রেখেই বলতে চাচ্ছি যে, ১৯৩৯ সালে ইউরোপে সাম্রাজবাদী যুদ্ধ বাধার কিছু পরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ২১শে জুন রুশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে সেই অসামঞ্জস্য সকলের চোখেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সেই যুগটা 'জনযুদ্ধের যুগ' হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের সম্বন্ধে প্রশ্ন না করেও বলা চলে ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের আহ্বানে গণ বিপ্লবের এক বিপুল অবকাশ উন্মুক্ত হয়েছিল কিন্তু এই আন্দোলনকে যারা গতিবেগ দেবে বলে ১৯৪০ সালেও লোকে আশা করেছিল, ইতিহাস বলছে, তারাই সর্বপ্রথম সেই আন্দোলনের গতিরোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু তবু ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কাণ্ডারীহীন জনগণ, 'সাঁতরা', 'বালিয়া', 'মেদিনীপুর' প্রভৃতি অনেক উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করল। সেই গণঅভ্যুত্থানে ছিল চির অপরিচিত জনগণ, চির অনাদৃত সন্ত্রাসবাদিগণ, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, ফরোয়ার্ড

ব্লক পন্থী, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী, বিপ্লবী সাম্যবাদী। সবদলের অধিকাংশ নেতারাও ছিলেন অনুপস্থিত, কারণ তাঁরা তখন জেলে।

আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায়' ৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যারা গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের মধ্যে বহরমপুরের শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, শশাঙ্ক শেখর সান্ন্যাল, ছত্রপতি রায়, জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, নিতাই গুপ্ত, নিরোদ সরকার, নির্মল বাগচি, কোলকাতায় ল'কলেজ হোস্টেল থেকে দেবেন্দ্র নাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, পরমেশ রাচৌধুরী, অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, নির্মল ভট্ট' মিহির মুখার্জী, ননী ভট্টাচার্য্য, অশোক ভট্ট, অনন্ত ভট্টাচার্য্য, গৌরী ভট্টাচার্য্য, সনৎ রাহা, সমর অধিকারী, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, নরেন বিশ্বাস, শীতল চৌধুরী, সুনীল মৈত্র, কুঞ্জ বণিক প্রভৃতি। সবিতা শেখর রায়চৌধুরীকে স্বগৃহে অন্তরীন করা হ'ল। ওদিকে জিয়াগঞ্জ থেকে দুর্গাপদ সিংহ, কমলু পাণ্ডে, বিমলু পাণ্ডে, কমল ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। ত্রিদিব চৌধুরীকে তো যুদ্ধ বাধার কয়েক মাস পরেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জঙ্গীপুর থেকে দুর্গা সুকুল, বিজয় ঘোষাল, সুরেশ কর, কেষ্ট চক্রবর্তী ; বহরমপুর থেকে রামচন্দ্র সাহা, ধনেশ ভট্টাচার্য, দিলীপ সিংহ, চপল সেন, সন্দিপ শেঠিয়া, বরুণ রায় ; বেলডাঙ্গার ডাঃ রাধাপদ পরামাণিক, ডাঃ রমাপদ পরামাণিক ; কান্দী মহকুমার কুণ্ডল গ্রামের কিরীটী দাসকে যেমন কানপুরে গ্রেপ্তার করা হ'ল তেমনি আত্মগোপনকারী প্রফুল্ল কুমার গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হ'ল উত্তর প্রদেশের আগ্রাতে।

সারা ভারতের অন্যান্য স্থানের জনতার মত মুর্শিদাবাদ জেলার জনতাও সে সময়ে নেতৃত্বহীন হলেও নিজ নিজক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী মত শক্তিকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। আমতলা, পাটকে-বাড়ীর গ্রামাঞ্চলেও পোস্টআফিসের বহ্ন্যুৎসব করতে জনসাধারণ দ্বিধা করেনি। দুর্গা সুকুল এবং মধু মাঝি সে সময়ে সাগরদীঘি থেকে

বীরভূমের কর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল বহরমপুরে।

সেই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মিঃ আর. সি. পোলার্ডের সঙ্গে আইনজীবী সত্যগোপাল মজুমদারের মামলার লড়াই হিসাবে বাংলাদেশে প্রসিদ্ধলাভ করলেও সেই মামলা বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দেলেন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।

'৪২-এর আন্দোলনের ইতিহাস বলছে যে, স্বাধীনতার কামনাকে গণ্ডীবদ্ধ করার অসাম্ভব্যতা জনগণের সহজ আক্রোশে রক্তাক্ষরে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বাংলার ১৯০৫-১৯১৪-১৯২১-১৯৩০-এর সীমা সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বহরমপুরের সেই আন্দোলন ছিল শান্ত, সংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। নিশান হাতে একটা মিছিল এগিয়ে চলেছিল দেওয়ানী আদালতের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল, যে আদালতকক্ষে অনেক অবিচার, অনেক কুবিচার এবং নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার হয়ে চলেছে দিনের পর দিন; ইংরেজের সেই আদালতকক্ষের মাথার উপরে জাতীয় নিশান উড়িয়ে দিতে হবে। ৯-ই সেপ্টেম্বরের সেই ঘটনার ইতিহাসে জজ সাহেবের খাসকামরায় অগ্নিসংযোগের কথা সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে বটে কিন্তু হিংসাত্মক ঘটনার কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। জনতার মিছিল এগিয়ে চলেছে, এই সংবাদে দিশেহারা হয়ে মিঃ আর. সি. পোলার্ড, ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টর মিঃ পি. সি. সেন গুপ্ত এক সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বহরমপুর জজকোর্টের দিকে রওনা হন। নিরস্ত্র জনতার সম্মুখে সেদিন সেই দু'জন বৃটিশ সরকারের বেতনভুক কর্মচারী গুলিভরা পিস্তল হাতে যে আস্ফালন দেখিয়েছিলেন, তার কয়েক সপ্তাহ পরেই জাপানীদের তাড়া খেয়ে বৃটিশ সিংহ শেয়ালের মত ল্যাজ গুটিয়ে বর্মা থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে জাপানের হাতে ছেড়ে দিয়েই প্রাণভয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করেছিল। এটাই ইতিহাস।

যাইহোক, কিংকর্তব্য বিমূঢ় দায়রা জজ্ মিঃ বি. কে. বসুর সম্মুখেই পুলিশ কর্মচারী এবং সশস্ত্র বাহিনী সেদিন চারটি বালককে গ্রেপ্তার করেছিল। যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তারা হ'চ্ছে জাতীয় নিশান হস্তে রজত কুমার ঘোষ, শান্তিময় ঘোষ, বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত এবং আরও একজন। সংবাদ গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হ'তে লাগল। ধৃত বালকদের উপর মার-ধোর করা হয়েছিল কিনা, তা জানি না; কিন্তু রজত কুমার ঘোষের মাতুল লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী সত্যগোপাল মজুমদার যখন বালক চারজনকে গ্রেপ্তারের কারণ প্রভৃতি জানার জন্য মিঃ পোলার্ডকে প্রশ্ন করেন, তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সেই বৃটিশ পুঙ্গব সত্যগোপাল মজুমদারকে একাধিকবার চপেটাঘাতে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বহু সংগ্রামে ঐতিহ্যমণ্ডিত বহরমপুর উকিলবার এবং সত্যগোপাল মজুমদারকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

ঘটনার ইতিহাস বলছে যে, রজত কুমার ঘোষ, শান্তিময় ঘোষ বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত প্রভৃতি ছেলেদের ছ'মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, আর অনেক জল ঘোলা করার পর মুর্শিদাবাদ জেলার দাম্ভিক পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ আর. সি. পোলার্ডের শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল। সেই মামলা সারা বাংলা দেশেই শুধু নয়, বাংলার বাইরেও বিশেষ এক আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। সত্যগোপাল বাবুর কাছে দক্ষিণ ভারত থেকেও অনেক সব তার বার্তা সে সময়ে এসে হাজির হয়েছিল।

আগস্ট আন্দোলন ও তার পর

বহুদিনের সঞ্চিত আক্রোশ, অভাব এবং অত্যাচার নির্যাতন ও অপমানের বিরুদ্ধে যে ঘনায়মান বিদ্বেষ জমা হয়েছিল, আগস্ট মাসে

কংগ্রেস নেতাদের ধর-পাকড়ের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রবল প্লাবনের মত দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড আন্দোলনে ফেটে পড়ল। শাসক সম্প্রদায় সেদিন বিস্মিত এবং ভীত হয়ে পড়েছিল ভারতের নিরীহ জনগণের শক্তির মহড়া দেখে। হাতে তাদের ছিলনা কোন হাতিয়ার, ছিলনা দল বা নেতৃত্ব করার কেউ, শুধু সীমাহীন বিদ্রোহের অসহ্য আগ্রহ ভারতের দিক-দিগন্ত মুহুর্মুহু কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। কিন্তু সেই অন্ধ আবেগ, ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ, অকুণ্ঠ ত্যাগ ও আত্মদান চেতনা, সংগঠন এবং নেতৃত্বের অভাবে উৎপীড়নের মুখে ঝিমিয়ে পড়েছিল।

ওদিকে সিঙ্গাপুর পতনের পর আতঙ্কিত ইংরেজ বাংলাকে ছাড়িয়ে পাটনা পর্যন্ত জাপানী আগমনের পথ উন্মুক্ত করে রাখল। ভারতের সীমানা পাটনা পর্যন্ত টানতে গিয়ে স্যার জন হার্বাট, বাংলা দেশকে এমনই মরুভূমিতে পর্য্যবসিত করলেন যে ১৯৪৩ সালে, তারই ধূলিস্তূপে দেখাছিল পঞ্চাশলক্ষ বিশুষ্ক মানুষের কঙ্কাল। চাল নেই, খাবার কিছু নেই, গ্রামে বহুদূরের গ্রামে চাষীর ঘরে সঞ্চিত সামান্য চাল ও পার হয়ে গেল পাটনার ওপারে। নদীমাতৃক বাংলার একমাত্র বাহন নৌকার হ'ল বহ্ন্যুৎসব, এমন কি সাইকেল পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা এবং থানায় রেজিস্ট্রী করা আরম্ভ হয়ে গেল।

বুভুক্ষার মিছিল আরম্ভ হয়ে গেল। পথের শেষ কোলকাতা। ইতিহাস বলছে, ১৯৪৩ সালে এই বাংলাদেশে পঞ্চাশলক্ষ মানুষের কঙ্কাল বীভৎস হাসি হেসে গিয়েছে আমার এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, বন্দেমাতরম বাংলাদেশে। কোলকাতার লক্ষ হর্ম্যের পাশে, কোলকাতার শতাধিক 'হাউসফুল' সিনেমার পাশে, ব্ল্যাক আউটের কোলকাতার হাজারো মসৃণ পীচঢালা পথে নীরব মৃত্যুর পূতিগন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে।

১৯৪২-এ, যে জনগণ সহস্র ফণা তুলেছিল, ইরেজের গ্রাম্য ঘাঁটি থানাগুলি আক্রমণ ও অধিকার করতে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ক্ষত সৃষ্টি করতে,

১৯৪৩ সালে সেই জনগণকেই দেখাগিয়েছিল, ফ্যানের পাত্র শিয়রে রেখে মরতে; যেখানে মা মরেছে মুমূর্ষু শিশুকে শেষ রক্তবিন্দু দান করে, শিশু মরেছে মৃত মায়ের স্তন চিহ্নে ঠোঁট দিয়ে, শিরদাঁড়া সোজা ক'রে যে চাষী হাল ধরত সে মরছে পাথরে মাটি খুঁজে। ১৯৪২ সালে বিপুল সংগ্রামে যারা সাম্রাজবাদীও দেশদ্রোহীর যূপকাষ্ঠে জীবন দিয়েছে ১৯৪৩ সালের 'পয়দা বাড়াও' আর 'জনযুদ্ধের' ইয়ার্কিতে যারা কঙ্কাল হয়ে বাস্তব শিল্পের প্রদর্শনী করেছে, তাদের সব কথা বলার সুযোগ এখানে নেই।

* পরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস বলছে, বাংলা দেশে মুসলিমলীগ যুদ্ধ পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর হয়েছিল এবং তাদের দাবিও ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত যোশীপন্থীদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মুসলিমলীগকেই দেখা গিয়েছিল। মনে হ'ল ভারতবর্ষ যেন দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। দুটি জাতি, সম্প্রদায় নয়। একটির নাম হিন্দু অপরটি মুসলমান।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরের গোরাবাজর কুমার হোস্টেলে ১৯৩৭ সালে সারা ভারত মুসলিম লিগ সম্মেলন হয়েছিল এবং "ইসলাম জ্যোতি" কাগজ ও সর্বভারতীয় লিগ নেতাও এই জেলাতেই উদ্ভদ হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে তখন তারাও বলতে আরম্ভ করেছে —'লড়কে লেঙ্গে।'

এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে লালবাগে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সম্মেলনে বি. সি. চাটার্জীকে যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি বামপন্থী বিপ্লবী নেতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, হুমায়ুন কবিরকে, লালনিঞা এবং আরও বহুখ্যাত ও অখ্যাত-নামা নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আমরা সেদিন সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। জেলা মুসলিমলিগের নেতারা 'মিলন চক্র ধ্বংস

হোক' শ্লোগান দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেও শেষ পর্যন্ত সেই সম্মেলন পণ্ড করতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে জেলার মুসলমান জনসাধারণের একটা বৃহত্তর অংশের উপরে মুসলিম লিগের প্রভাবই বেশী। রাত্রিদিন নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। 'ইংরেজের আওতায় অহিংস প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস আর সহিংস প্রতিষ্ঠান লীগ ভারতের বুকে বসালো ভাগের করাত। গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বরাজী কংগ্রেসীরা তাতে গররাজী হ'তে মুসলিম লীগ বলল, 'লড়কে লেঙ্গে।'

এইখানে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি বেতার ভাষণে বলেছিলেন "1946 will be a crucial year in India's history". ১৯৪৬ সাল সত্যই তাই হয়েছিল। তার মধ্যে সমপ্রধান ঘটনা হ'চ্ছে বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন ক্যাবিনেট মিশন, ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট, ব্যাপক ডাক ও তার ধর্মঘট, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, 'স্টেটস্‌ম্যানের' ভাষায় 'দিগ্রেট ক্যালকাটা কিলিং', নোয়াখালী, বিহারের বিভৎসতা, কংগ্রেস-নেতাদের দ্বিজাতিতত্ত্বের জুপকাষ্ঠে আত্মনিবেদন। দম বন্ধ হয়ে আসে, তবু বলে যেতে হয় ১৯৪৭-এর ভঙ্গ-বঙ্গ তীরে সাঁতরে ওঠার জন্য।

১৯৪৬ সালের অতবড় সফল ডাক-তার ধর্মঘটের পর কেউ কি ভেবেছিল যে, এই বাংলাদেশে তার অল্প কিছুকাল পরে অত বড় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হ'তে পারে? ডাকের ঝোলা পিঠে নিয়ে যারা মানুষের দুয়োরে দুয়োরে ডাক বিলি করে বেড়াতেন, তারা সেদিন যে নতুন ডাক নিয়ে এসেছিলেন, তাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন কোলকাতায় তারাপদ মেমোরিয়াল হলে যে সারাভারত পোস্টাল ও আর. এম. এস. ইউনিয়নের সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালিন ইউনিয়ন সম্পাদক বিজয় কুমার গুপ্ত।

অবশেষে পরিকল্পনা করে মুসলিম লীগ কোলকাতায় যে লড়াই লাগালো তাতে একদিনে হাজার দশেক মানুষ খুন হ'ল। বাংলায় তখন লীগের রাজত্ব। মিঃ সুরাবর্দী প্রধান মন্ত্রী। আগুনের ফুলকি লাগলো নোয়াখালী, ত্রিপুরায়। অসংখ্য গৃহ দাহ হয়ে গেল। বিহারে তা দাবানলের সৃষ্টি করল। মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি ও উত্তপ্ত হয়ে উঠল, বলল—'লড়কে লেঙ্গে'। স্মরণ হ'চ্ছে মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন একবার বলেছিলেন—"কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আনবে, আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রাম করে পাকিস্তান আনবো।" ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের যে সংগ্রাম, তা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই। অবশেষে কংগ্রেস দেশের বুকে করাত চালাতে রাজী হয়ে গেল।

যদি বলি, ভারতবর্ষকে ভারতীয় জনসাধারণ কেটে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র গড়েনি, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িক বণিক স্বার্থই নিরঙ্কুশ আধিপত্যের জন্য রাজনৈতিক প্রবক্তাদের দিয়ে এই রক্তাক্ত রূপরেখা টেনেছে, তা হলে কি কিছু ভুল হবে? যুক্ত প্রদেশের সব চাইতে শিক্ষিত, সব চাইতে অভিজাত মুসলমানেরা একদিকে এবং বোম্বাময়ের অগ্রসর হিন্দু বুর্জোয়ারা অন্যদিকে নিয়েছিল এই নেতৃত্ব; হাড় মাংস দিয়েছে বাংলা দেশের মত ভাবপ্রবণ এবং ধর্মপ্রবণ প্রদেশগুলো। তারাই এই মহাপূজার বলি।

মুসলিমলীগ হিন্দুস্থান কেটে পাকিস্তান বের করে নিল। মুর্শিদাবাদের জেলা পাকিস্তানে চলে গেল। তিন দিন, তিন রাত্রি মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ পাকিস্তানের স্বাদ পেয়েছে আর খুলনার মানুষ পেয়েছে ভারত ভুক্তির উত্তেজনা। অবশেষে ইংরেজের হাতেই পাশার দান পাল্টে গেল। গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাই ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হ'ল আর খুলনাসহ গোটা পূর্ব-বাংলার নাম হ'ল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের মাংসপিণ্ডে থাকল অখণ্ড ভারতের

অসংখ্য, অগণিত শহীদের রক্ত আর অহিংস খোদাই খিদমদকারের লাঞ্ছনা আর ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল মহিমা।

রাষ্ট্র পরিবর্তনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ক'রে ইংরেজ বিদায় নিল। যে বিরাট অট্টালিকাতে ১৯০ বছর ধরে মাউন্টব্যাটেনেরা বংশ পরম্পরায় বসবাস করেছিলেন, সেই বাড়ীটা থেকে তারা বেড়িয়ে যেতেই, সেখানে নেহরুরা গিয়ে ঢুকলেন; কিন্তু প্রবেশের অনুমতি পেয়েও নগ্ন, নিরন্ন, বাস্তুহীন জনগণ নিরুদ্বিগ্ন হ'তে পারল না—

মুর্শিদাবাদ হ'ল সীমান্ত জেলা

মুর্শিদাবাদ হয়ে গেল একটি সীমান্ত জেলা। যে, মুর্শিদাবাদের বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একদিন রাজশাহী এবং নদীয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্রে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা রচনা করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, জেল খেটেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সীমান্ত পার হয়ে মুর্শিদাবাদে চলে এলেন অনেকে। অখণ্ড বাংলার মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে সর্বজন পরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত বিপ্লবী শহীদ নলিনী বাগচীর দোশর প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, তাঁর ভ্রাতা বিপ্লবী জীতেশচন্দ্র লাহিড়ী, রাজসাহীর প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কালিদাস চক্রবর্তী, বিভূতি ভট্টাচার্য রংপুরের বিমলকান্তি মৈত্র, মৈমনসিং-এর মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকেই মুর্শিদাবাদের অধিবাসী হলেন।

মহিলাদের অবদান

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলায় মহিলাদের অবদানও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সেই সব সমর্পিতপ্রাণ মহিলাদের কে যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন, বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে

গিয়েছেন, তাঁদের সকলের নামগুলি সংগ্রহ করাও আজ প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার বলেই মনে হ'চ্ছে। বর্তমান সমাজ তো জীবন্ত মানুষেরই সমাহার। জানি প্রবাহমাণ কালের সঙ্গে যা যুক্ত; মানুষ তাকেই শুধু কবুল করে। আধুনিক কথাটা সব কালেই তাই প্রকাণ্ড একটা অহংকারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আর এই হাতিয়ার প্রতি প্রজন্মই উঁচিয়ে ধরে তার পূর্বাচার্যদেব উদ্দেশ্যে। জীবনের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের ছোট-বড় প্রতিদিনের সহস্র টুকরো নিয়ে যে বাস্তব সত্য হয়ে রয়েছে চোখের সামনে তার সঙ্গে পুরোনোর যোগসূত্র আলগা হয়ে যায়। মাঝখানের শূন্য আকাশে জড় হয় অপরিচয়ের মেঘ এবং গতদিনের ক্ষীণপ্রভ ও ক্ষণস্থায়ী তারা। যারা তারা বেবাক অন্ধকারে হারিয়ে যায়। দ্যুতিমান যারা তারা হয় তো নিরুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ হয়ে কোন মতে টিম টিম করতে থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে বসে উপরিউক্ত কথাগুলি বারবার মনে হয়েছে, মেয়েদের ক্ষেত্রে কথাগুলি হয়তো আরও বেশী প্রযোজ্য। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁরা কে যে কোথায় পরবর্তীকালে হারিয়ে গিয়েছেন, তার কি কোন ঠিকানা আছে? তবু আমার মনের আকাশে নিরুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ হয়ে কোন মতে টিম, টিম করছেন যাঁরা তাঁদের কয়েকজনের নামই শুধু উল্লেখ করছি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রমীলা দেবী, মৃণাল দেবী, শৈল মল্লিক, রাজলক্ষ্মী দেবী, সনৎকুমার রাহার মাতা ও ভগ্নি, চাঁপাঠাকুরের কন্যা, ননী বাগচীর মাতা, অশোক ভট্টের মাতা, সকলের শ্রদ্ধেয়া মাসীমা নগেন অধিকারীর স্ত্রীর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। কিন্তু কারা বরণ না করেও যাঁরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শশাঙ্ক শেখর সান্যালের মাতা, কবিরাজ জ্যোতিষ চন্দ্র গুপ্তের কন্যা ও স্ত্রী, তারা দাসের স্ত্রী, টগর গোস্বামীর স্ত্রী, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য এবং ছত্রপতি ভায়ের স্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নেপথ্য নায়ক

মহাকাব্যে যারা উপেক্ষিত হয়েছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাদের উপেক্ষা করেন নি। মহর্ষি বাল্মিকীর কমণ্ডলুর এক ফোঁটা বারিবিন্দুও যাদের লালাটে বর্ষিত হ'ল না, তাদের বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন আমাদের চেতনা রাজ্যে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তেমন কিছু মানুষের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়, যাঁরা চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যান। তাঁদের কাজ ঠিক যেন সাজঘরে বসে সাজিয়ে দেওয়ার কাজ। দর্শকের দৃষ্টি সেখানে অনুপস্থিত, অথচ ভেবে দেখলে দেখা যায়, তাঁদের কাজটিও কিছু কম নয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে বসে তেমন কিছু মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না, যারা লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে অতিসঙ্গোপনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বপ্রকারে সাহায্য এবং সহযোগিতা করে গিয়েছেন। অথচ কেউ জানে না তাঁদের নাম, কোন খবরের কাগজে লেখা হয়নি তাঁদের কথা। তাঁরা চিরবিস্মৃত হবার জন্যই হয়তো জন্মায় ও বিলীন হয়ে যায় নেতৃত্বে কৃতিত্বের দাগকে অক্ষয় করতে। আজ ১৯৪৪-এর এক সূর্যাস্ত সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের অস্পষ্ট ছায়া-ছবিগুলি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সিলুয়েটের ছবির মত। সেই উপেক্ষিত-উপেক্ষিতাদের কয়েকজনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে। আমি জানি আমার হিসাবের বাইরে আরও অনেক অখ্যাত, অজ্ঞাত মহাপ্রাণ আছেন, যাঁরা সেদিন সব রকমের বিপদের ঝুকি নিয়েও বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের কথা তো আমার জানা নেই, যাদের কথা জানা আছে, তাঁদের মধ্যে পঙ্কোজকুমার সাহা, প্রিয়মাধব গুপ্ত, ললিতমোহন দত্তের কথা

প্রথমেই মনে পড়ছে। কিছুদিনের ব্যবধানে তারা একে একে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। প্রিয়মাধব বা বিশুর মৃত্যুটা মর্মান্তিক হলেও ডাক পিওন পঙ্কোজ সাহা এবং সিভিল কোর্টের পেশকার ললিতমোহন দত্ত পরিণত বয়সেই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। যারা জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে জগৎসিং লোঢ়া, গোরা দত্ত, প্রণবকৃষ্ণ রায়, খবরের কাগজের প্রখ্যাত হকার তারা দাস, টগর গোস্বামী, সুধাংশু শেখর রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদাসমাটির তারাপদ চক্রবর্তীর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। কোচবিহারের যুবক তারাপদ চক্রবর্তী সে সময়ে বহরমপুরে থেকে আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কোলকাতাতে থেকেও সবসময়েই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছেন। এদের বাদ দিলে সংগ্রামের একটা দিকই বাদ পড়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের তালিকায় তাঁদের নাম সংযোজিত না হলেও তাঁরা সকলেই সংগ্রামের নেপথ্য নায়ক

ইতিহাস গতিশীল, ইতিহাস চলমান। তার এই চলার গতিছন্দে যে তরঙ্গ ওঠে সেই তরঙ্গাঘাতে কত স্মৃতি বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যায়, কত জয়স্তম্ভ মূঢ়ের মত অর্থহীন অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; কিন্তু সেই অতীতের অন্ধকারের মধ্যে আবার এমন কতগুলি বস্তুও থাকে যা কোন দিনই মুছে যায় না—মনের গহনে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির মত তা জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। একটি ব্যক্তির জীবনেই শুধু নয়, একটি জাতির জীবনেও তা প্রেরণা সঞ্চার করে।

কিছু দিন আগে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলের যে ঘরটিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাস করেছিলেন সেই ঘরটিকে বিশ্লিষ্ট করে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। শহীদতীর্থ আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে পণ্ডিত জওহরলালকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, কিন্তু আলিপুর জেলের যে সেলের মধ্যে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ একদিন

অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন, আমরা স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত সেই ঘরটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও, যাঁরাই সেই জেলে গেছেন, তাঁরাই সেই সেলের সম্মুখে গিয়ে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছেন, এক কয়েদী গিয়েছেন তো আর এক কয়েদী এসেছেন, কিন্তু মুখে মুখে ঘুরেছে সেই অলেখা ইতিন "Here lived sri Arabinda Ghosh।" মুরারীপুকুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও অভিযুক্ত হন। সেদিন কি কেউ জানতো যে, অভিযুক্ত-দের মধ্যে এক অজ্ঞাত দার্শনিক ছিলেন, যাঁর বাণী একদিন সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।

অবিভক্ত বাংলায় বহরমপুরে কোন সেণ্ট্রাল জেল ছিল না, ছিল একটি মাত্র ডিস্ট্রিক্ট জেল। কিন্তু সেই জেলটি যেমন ছিল সুরক্ষিত তেমনি সুদৃঢ়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বহরমপুরে। শোনা যায় যে, সেই সমসাময়িককালেই নাকি এই কারাগারটি নির্মিত হয়েছিল। সুরক্ষিত এই কারাগারটি তাই ডিস্ট্রিক্ট জেল হলেও তখনকার দিনে অনেক খ্যাতনামা বীর-বিপ্লবীর পদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। ভাগীরথীর তীরে বিরাট এক এলাকা জুড়ে আজও সেই কারাগারের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কারাপ্রাচীরের অন্তরাল আজ আর কোন শৃঙ্খলিত বন্দীর মর্মবেদনা গুঞ্জরিত হয় না। ফাঁসীর মঞ্চের ওপরে আজ আর সন্ধ্যায় কোন আলো জ্বলে না। এখন তা জীর্ণ এবং অর্থহীন। ফাঁসি সেলের এবং অন্যান্য সেলগুলির মধ্যে এখন আগাছা জন্মেছে, লোহার গরাদ-গুলি মোরচে ধরে জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু আছে, সেই বিখ্যাত গাছটি আজও আছে; যে গাছের নীচে বসে বিয়াল্লিশ বছর আগে বিদ্রোহী কবি নজরুল গান গেয়েছিলেন—

"ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।"

সেদিন সেই গানের সুর-তরঙ্গে শুধু ভীমকারার ভিত্তিই কেঁপে ওঠেনি, হয়তো ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তিমূলও শিথিল হয়ে এসেছিল। আজও সাত নম্বরের সেই দো-তলা দালানটি তেমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে ঘরে তিন নম্বর রেগুলেশন আইনের বন্দী সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত দু'একটি আসবাবপত্র আমরা বত্রিশ সালেও দেখেছি সেই ঘরে।

কারাপ্রাচীরের অদূরে ভাগীরথীর জলধারা সাত নম্বর ঘরের গরাদ ধরে দাঁড়ালে ভাগীরথীর পরপারে ধূসর বনানীর প্রান্তসীমা দৃষ্টিগোচর হয়। তারই কিছু দূরে খোসবাগ—সিরাজ সমাধি। স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার ব্যথা-দীর্ণ ইতিহাস। সুভাষচন্দ্র মুর্শিদাবাদে বহুবার এসেছেন। খোসবাগও পরিদর্শন করেছেন। সিরাজ সমাধি পরিদর্শন কালে তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হ'তে দেখেছি, কিন্তু সাত নম্বর ঘরের জানালার লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্রর চোখে ভবিষ্যৎ ভারতের কোন্ স্বপ্ন ভেসে উঠেছিল তা জানি না।

কিন্তু বহরমপুর জেলের সেই সাত নম্বর দালান আজও আছে। আছে চার নম্বর এবং অন্যান্য ব্যারাকবাড়ীগুলি—যেগুলিতে বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলী, সতীন সেন, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অগণিত বীর-বন্দীদের শেকল-ঝঞ্জনা মুক্তিপথের অগ্র-দূতের চরণ বন্দনা করেছিল।

বহরমপুরে একটি সেন্ট্রাল জেল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পুরাতন কারাগারটি ব্রোস্টাল স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, কারাগারটি এখন পরিত্যক্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোণে-কোণে লুকানো সেই অন্ধকারের মাঝে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের স্মৃতি অনেক মণিমাণিক্য জ্বল জ্বল করে জ্বলছে! বহুকাল পরে সেদিন পরিত্যক্ত কারাগারটি দেখে এসেছি। এই ঐতিহাসিক কারাগারটি ভেঙ্গে ফেলা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার শহরে, গ্রামে এবং গঞ্জে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আর জীবিত নেই ; যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এখন বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ অথবা বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় এসে পৌচেছেন। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসর থেকে জাতীয় সরকার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেককে যেমন তাম্রপত্র দানে সম্মানিত করেছেন, তেমনি মাসিক একটা ভাতা দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বহিরাগত কিছু সংখ্যক সংগ্রামী সাথী যাঁরা বর্তমানে এই জেলায় বসবাস করছেন, তাঁরা সকলেই মুর্শিদাবাদ জেলা কালেটারের কাছ থেকেই ভাতা পেয়ে থাকেন। তাঁদের মোটা-মুটি একটা নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরলোকগত সংগ্রামীদের স্ত্রীরাও অনেকে মঞ্জুরীকৃত ভাতার অর্ধাংশ পেয়ে থাকেন। তাঁদের নাম এই তালিকায় সংযোজিত হয়নি। পরে পূর্ণ তালিকা প্রকাশের আশা রাখি।

ক্রমিক নম্বর	নাম	ঠিকানা
১।	শ্রীসুধাংশু কুমার লাহিড়ী	ঘাটবন্দর
২।	,, অভয়পদ মুখার্জী	কাশিমবাজার
৩।	,, বিমল ভৌমিক	লালবাগ
৪।	,, হিমাংশুভূষণ মুখার্জী	বহরমপুর
৫।	,, বৈদ্যনাথ পাণ্ডে	গোরাবাজার
৬।	,, সুবোধকুমার ঘোষ	বহরমপুর
৭।	,, দীনবন্ধু দাস	গোকর্ণ, কান্দী
৮।	,, কবিরাজ বলরাম সেনগুপ্ত	বেলডাঙ্গা
৯।	,, সুনীলা মুখার্জী	,,

ক্রমিক নম্বর	নাম	ঠিকানা
১০।	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী	বহরমপুর
১১।	„ সূর্যকুমার সরকার	খাগড়া
১২।	„ অধীরকুমার মুখার্জী	„
১৩।	„ ভূপেন্দ্রনাথ সরকার	বেলডাঙ্গা
১৪।	„ ছত্রপতি রায়	বহরমপুর
১৫।	„ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	পাটিকাবাড়ী
১৬।	„ মুকুন্দলাল সেন	খাগড়া
১৭।	„ রাজেন্দ্রমোহন সরকার	বহরমপুর
১৮।	„ রামচন্দ্র সাহা	গোরাবাজার
১৯।	„ শিবনাথ সমাজদার	বেলডাঙ্গা
২০।	„ শচ্চিদানন্দ বাজপেয়ী	প্রতাপপুর (হরিহরপাড়া)
২১।	„ ষোড়শী কুমার বাহা	বহরমপুর
২২।	„ সত্যনারারণ গোস্বামী	খিদিরপুর কলোনি
২৩।	„ সুরেশচন্দ্র সরকার	গোশজান
২৪।	„ শশাঙ্কশেখর রায়	পাহাড়পুর (লালবাগ)
২৫।	„ ঘনশ্যাম দাস	সাহানগর
২৬।	„ গোপালচন্দ্র দাস	লালগোলা
২৭।	„ রামকুমার সেন	রঘুনাথগঞ্জ
২৮।	„ অনিলকুমার সাহা	জিয়াগঞ্জ
২৯।	„ সত্যশংকর মুখার্জী	কান্দী
৩০।	শ্রীসাবিত্রী চন্দ্র মুখার্জী	কান্দী
৩১।	„ সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য	„
৩২।	„ দ্বিজকুমার শংকরী	„
৩৩।	„ ভুবনমোহন সিংহ	„
৩৪।	„ উমাকান্ত উপাধ্যায়	জঙ্গীপুর
৩৫।	„ সরলকুমার গুহ	আওরঙ্গাবাদ

ক্রমিকনম্বর	নাম	ঠিকানা
৩৬।	শ্রীসুধীরকুমার মুখার্জী	জঙ্গীপুর
৩৭।	„ ভবানীশংকর পাল	„
৩৮।	„ বরুণ রায়	„
৩৯।	„ অমরেন্দ্র নাথ দাস	হিলোড়া (জঙ্গীপুর)
৪০।	„ সুশীলকুমার ঘোষ	কান্দী
৪১।	„ কালিকিংকর গণাই	বেলডাঙ্গা
৪২।	„ কেদারনাথ দাস	জিয়াগঞ্জ
৪৩।	„ কমলাচাঁদ পাণ্ডে	„
৪৪।	„ জীতেন্দ্রনাথ রায়	লালবাগ
৪৫।	„ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	জিয়াগঞ্জ
৪৬।	„ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	গোপজান
৪৭।	„ ফণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	বহরমপুর
৪৮।	„ সৌরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	„
৪৯।	„ শিশিরকুমার ব্যানার্জী	মাড়গ্রাম
৫০।	„ সুধীরকুমার ব্যানার্জী	লালবাগ
৫১।	„ শচীন সেনগুপ্ত	জঙ্গীপুর
৫২।	„ সবিতাশেখর রায়চৌধুরী	গোরাবাজার
৫৩।	„ শিবেন্দ্রনারায়ণ রায়	„
৫৪।	„ তারাপদ সরকার	টেনকারায়পুর
৫৫।	„ তারাপ্রসন্ন বসুসর্বাধিকারী	গোরাবাজার
৫৬।	„ তারাপদ গুপ্ত	„
৫৭।	„ ত্রিপুরানন্দ মিশ্র	কান্দী
৫৮।	„ উমাকান্ত মৈত্র	সৈদাবাদ
৫৯।	„ সুধাংশু সেনগুপ্ত	বহরমপুর
৬০।	„ প্রহ্লাদচন্দ্র বোস	„
৬১।	শ্রী জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল	বেলডাঙ্গা

ক্রমিক নম্বর	নাম	ঠিকানা
৬২।	শ্রীজগন্নাথ গনাই	বেলেডাঙ্গা
৬৩।	,, ননীগোপাল ব্যানার্জী	,,
৬৪।	,, প্রফুল্লকুমার ব্যানার্জী	খাগড়া
৬৫।	,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র	গোরাবাজার
৬৬।	,, আশুতোষ সান্যাল	খাগড়া
৬৭।	,, ধীরেন্দ্রমোহন সরকার	,,
৬৮।	,, হরিপদ সরকার	বহরমপুর
৬৯।	,, যোগেন্দ্রনাথ দেব	,,
৭০।	,, সন্তোষকুমার রায়	,,
৭১।	,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ	জঙ্গীপুর
৭২।	,, বিশ্বনাথ অধিকারী	ফরাক্কা
৭৩।	,, বিষ্ণু সিংহ	জঙ্গীপুর
৭৪।	,, ফণীভূষণ ব্যানার্জী	,,
৭৫।	,, নিরঞ্জন সিংহ	,,
৭৬।	,, নির্মলকুমার সিংহ	আলুগ্রাম (কান্দী)
৭৭।	,, জগৎবন্ধু দাস	গোকর্ণ
৭৮।	,, মাধাইচন্দ্র দাস	কান্দী
৭৯।	,, সুবিমল সরকার	লালবাগ
৮০।	,, প্রভাতচন্দ্র সরকার	জিয়াগঞ্জ
৮১।	,, ফণীভূষণ সেনগুপ্ত	,,
৮২।	,, মতিলাল পাণ্ডে	,,
৮৩।	,, রেণুবাল মুখার্জী	,,
৮৪।	,, হরেন বিশ্বাস	খাগড়া
৮৫।	,, আলোরাণী বিশ্বাস	বহরমপুর
৮৬।	,, গণেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	,,
৮৭।	,, মলিনা মুখার্জী	খাগড়া

ক্রমিক নম্বর	নাম	ঠিকানা
৮৮।	শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী	বেলডাঙ্গা
৮৯।	,, বিমল পাণ্ডে	খাগড়া
৯০।	,, শ্রী বাসুদেব রায়চৌধুরী	পাটকেবাড়ী
৯১।	,, হেমদাকান্ত চক্রবর্তী	বহরমপুর
৯২।	,, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস	বেলডাঙ্গা
৯৩।	,, প্রফুল্লকুমার সাহা	জিয়াগঞ্জ
৯৪।	,, অরুণকুমার বাগচী	লালগোলা
৯৫।	,, ভাবনাপ্রসাদ সাহা	জিয়াগঞ্জ
৯৫।	,, গায়িত্রী দত্ত	,,
৯৭।	,, হরিপদ রায়	লালগোলা
৯৮।	,, বিনয়কুমার চৌধুরী	কান্দী
৯৯।	,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ	আলুগ্রাম (কান্দা)
১০০।	,, সৈয়দ এ, আর, ফেরদোসি	গোকর্ণ
১০১।	,, মৃণাল দেবী	জঙ্গীপুর
১০২।	,, বিজয়কুমার ঘোষাল	,,
১০৩।	,, সত্যচরণ কর্মকার	ভাবতা
১০৪।	,, সুকুমার রায়চৌধুরী	খাগড়া
১০৫।	,, রাধাগোবিন্দ পরামানিক	সর্বনগর
১০৬।	,, রামপদ পরামানিক	শক্তিপুর
১০৭।	,, অভিরঞ্জন সাহা	জিয়াগঞ্জ
১০৮।	,, গোপেনচন্দ্র খান	,,
১০৯।	,, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়	,,
১১০।	,, নীলমণিচন্দ্র পরামানিক	,,
১১১।	,, অহিভূষণ ব্যানার্জী	বড়এা
১১২।	,, মধুসূদন সেনগুপ্ত	কান্দী
১১৩।	,, শিবরাম চ্যাটার্জী	ভরতপুর

ক্রমিক নম্বর		নাম	ঠিকানা
১১৪।	শ্রী	শিবেন্দ্রনাথ দাস	খাগড়া
১১৫।	,,	শ্যামাপ্রসন্ন চট্টপাধ্যায়	রঘুনাথগঞ্জ
১১৬।	,,	হৈমবতী সাধু	,,
১১৭।	,,	বৃন্দাবনচন্দ্র রায়	জিয়াগঞ্জ
১১৮।	,,	করুণাসিন্ধু দে	,,
১১৯।	,,	গোলাপচন্দ্র বোথরা	আজিমগঞ্জ
১২০।	,,	বৈদ্যনাথ দাস	গণকর
১২১।	,,	হেমলতা দেবী	বহরমপুর
১২২।	,,	অবদুল গফুর মোল্লা	নওদা
১২৩।	,,	কালাচাঁদ মালাকার	নওদা
১২৪।	,,	কামাক্ষাপ্রসাদ ধর	বহরমপুর
১২৫।	,,	রমণীমোহন ঘোষ	বেলডাঙ্গা
১২৬।	,,	শুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য	বহরমপুর
১২৭।	,,	ক্ষিতিশচন্দ্র মৈত্র	,,
১২৮।	,,	বসুমতী লোধ	,,
১২৯।	,,	দুর্গাপদ সিংহ	জিয়াগঞ্জ
১৩০।	,,	রবীন্দ্রলাল সেন	খাগড়া
১৩১।	,,	রবীন্দ্রনারায়ণ রায়	লালগোলা
১৩২।	,,	রেবতীমোহন দে	কাশিমবাজার
১৩৩।	,,	রাজলক্ষ্মী দেবী	খাগড়া
১৩৪।	,,	কালিচরণ চৌধুরী	,,
১৩৫।	,,	জগন্নাথ ব্যানার্জী	বেলডাঙ্গা
১৩৬।	,,	মণীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র	লালগোলা
১৩৭।	,,	পিয়ারীচাঁদ বাছাওয়াৎ	জিয়াগঞ্জ
১৩৮।	,,	শৈলেন অধিকারী	,,
১৩৯।	,,	অমিয়া কুশারী	বহরমপুর

ক্রমিক নম্বর	নাম	ঠিকানা
১৪০ ।	শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ	কান্দী
১৪১ ।	,, গঙ্গারাম সরকার	জিয়াগঞ্জ
১৪২ ।	,, গোপালচন্দ্র দুবে -	গোরাবাজার
১৪৩ ।	,, হীরেন্দ্রকুমার হোড়	বহরমপুর
১৪৪ ।	,, নরেন্দ্রকুমার দত্ত	গোরাবাজার
১৪৫ ।	,, প্রফুল্লকুমার গুপ্ত	,,
১৪৬ ।	,, শীতলচন্দ্র চৌধুরী	খগড়া
১৪৭ ।	,, ধরণীধর ঘোষ	পো-পাড়া, সাগরদীঘি
১৪৮ ।	,, কর্তিকচন্দ্র পাণ্ডে	কান্দী
১৪৯ ।	,, নৃত্যগোপাল বাগচী	বহরমপুর
১৫০ ।	,, সবিতা ঘোষাল	জঙ্গীপুর
১৫১ ।	,, সুবাসচন্দ্র বোস	বহরমপুর
১৫২ ।	,, যতীন্দ্রনাথ সিংহ	গোরাবাজার।
১৫৩ ।	,, ভোলানাথ সরকার	জিয়াগঞ্জ
১৫৪ ।	,, কালিনারায়ণ সিংহ	,,
১৫৫ ।	,, শান্তিরাণী দাঁ	কান্দী
১৫৬ ।	,, বিমলা মুখার্জী	বহরমপুর
১৫৭ ।	,, অহীভূষণ পাল	খাগড়া
১৫৮ ।	,, নির্মলেন্দু শেখর বাগচী	বহরমপুর
১৫৯ ।	,, রতিনাথ ব্যানার্জী	কান্দী
১৬০ ।	,, শৈলেশচন্দ্র রায়	কাশিমবাজার
১৬১ ।	,, শশধর প্রধান	কান্দী
১৬২ ।	,, রবীন্দ্রকুমার সেন	বহরমপুর
১৬৩ ।	,, রামপদ মজুমদার	,,
১৬৪ ।	,, দুর্গাপদ মুখার্জী	জিয়াগঞ্জ
১৬৫ ।	,, রাধাশ্যাম ভাস্কর	শেলডাঙ্গা

বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য

দেশপ্রেম একটা গভীর অব্যক্ত আবেগ ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু সামান্যও নয়। বয়স হ'লে স্বাস্থ্য যায়, কিন্তু আবেগ যায় না। যৌবনে সংযমও বেশি থাকে; আবেগকে সংযমে নির্বাক নিষ্ক্রিয় করে রাখা যায়।

বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথাগুলি বললে হয়তো ভুল বলা হবে। ৬৭-৬৮ বছর বয়সে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তার সংগ্রামী জীবনে সে কখনও গান্ধীবাদী, কখনও সন্ত্রাস-বাদী, কখনও কম্যুনিস্ট আবার কখনও নকশালপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে, কিন্তু সংগ্রামে বিরতি ঘটেনি কোন সময়ে। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য গিয়েছিল, কিন্তু আবেগ যায়নি। দেশ-প্রেমের একটা অব্যক্ত আবেগ নিয়ে তাঁকে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াতে দেখেছে জেলার মানুষ। যেদিন কোলকাতা গেল, সেদিনও 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ' এই বইখানি প্রকাশ হ'তে দেরি হ'চ্ছে দেখে সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছিল। বলেছিল—'যা করবার তাড়া-তাড়ি কর।' বই-এর পাণ্ডুলিপি পাঠ করে সে আমাকে যে চিঠিখানি দিয়েছিল, তা এই গ্রন্থের সঙ্গেই জুড়ে দিলাম। অবশেষে বই বের হ'ল, কিন্তু অনন্ত ভট্টাচার্য আর তা দেখে যেতে পারল না।

"লিখবো বলে নয়"

পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত—

যুগান্তর : প্রফুল্ল কুমার গুপ্তের লেখায় এমন এক বিরল আন্তরিকতা ও দৃঢ়প্রত্যয় আছে যে, পাঠকের চিত্তকে তা অনায়াসেই স্পর্শ করে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা আত্মনিবেদন করেছিলেন এবং এখনও যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন লোকসেবা করে চলেছেন প্রফুল্ল কুমার তাঁদের অন্যতম। প্রফুল্ল কুমার একজন দক্ষ সাংবাদিকও বটেন.। বৈপ্লবিক ও সাংবাদিক জীবনে তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এ রচনাগুলো তারই ফলশ্রুতি।

প্রথম প্রবন্ধের নামে বই এবং বইটির নামের সার্থকতা রক্ষা করে তিনি বলেছেন, নিছক লেখার জন্য যে লেখা সে জলের রেখা, কিন্তু যে লেখা লোকের চিত্তকে নাড়া দেয়, একটা উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের ইসারা দেয়, মানুষকে জানোয়ার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনুষত্বে উদ্বোধিত করে তেমন লেখাই লেখা এবং তেমন লেখা তাঁরাই লিখতে পারেন যাঁদের জীবনে আদর্শ ধ্রুবতারার মত স্থির। লেখক সেইসব লেখকের কথা স্মরণ করেছেন, 'যারা দেশের বুকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ....সেই বিস্ময়কর মনীষার নিরবচ্ছিন্ন ধারাই তো সেদিন বৈপ্লবিক জীবনদর্শনের নিষ্করুণ অথচ গৌরবোজ্জ্বল পথযাত্রায় অবিরাম প্রেরণা সঞ্চার করে গিয়েছে.......।' তিনি বলছেন, 'চার পাশের কাতর সুষুপ্ত মানুষকে শোনাতে হবে তারই অপ্রকাশিত কথা —কেননা, ভাল করে চেয়ে দেখলে দেখা যাবে, এমন যে ঘৃণ্য, নগণ্য ও অপদার্থ জীবন সে যাপন করছে, তার সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনেরও সে যেন একটা অর্থ খুঁজতে চায়।'

বলা বাহুল্য ঠিক এই বিশ্লেষণাত্মক অথচ মানব হিতৈষণার মনোভঙ্গীতেই 'সাহিত্য বিচার' করছেন 'শিল্পীও সাধক' 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুমাধুরী', 'বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বাণী' বিচার করেছেন লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। রাজনৈতিক পটভূমিকায় 'দাঙ্গার পটভূমিতে গান্ধীজী' এবং 'একটি গান্ধী দুটি মন' প্রবন্ধ দুটি পাঠকের মনে এই প্রেরণার সঞ্চার করে যে, নির্বিচার শ্রদ্ধাশীলতার ভিত্তিভূমি যেমনই শিথিল, প্রজ্ঞার কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে যে উজ্জ্বল শ্রদ্ধার সুষমা চিত্তকে উদ্ভাসিত করে, তা তেমনই নির্ভরযোগ্য ; গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ত্রুটি বিচার সেখানে নির্মম।

আনন্দবাজার : প্রবন্ধগুলো প্রমাণ করে তিনি শুধু সত্যেরই দাবিদার নন আপন বিশ্বাসকে সত্যভাবে পেশ করতেও জানেন। ....তাঁর দৃষ্টির গভীরতা এবং কলমের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা।

দৈনিক বসুমতী : সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি এই পুস্তকে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত এই বইখানি প্রত্যেক স্কুল, কলেজ এবং সাধারণ লাইব্রেরীতে রাখার উপযুক্ত একটি মূল্যবান পুস্তক। দাম—ছয়টাকা

কম্পাস পাবলিকেশন্‌স্‌ লিমিটেড্‌
১৪ ক্ষুদিরাম বসু রোড্‌
কলিকাতা—৬